Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প : বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের শিল্পরূপ

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাবেদ ইকবাল
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.6
Pages	১৩৯-১৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প : বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের শিল্পরূপ

জাবেদ ইকবাল*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর জীবনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও ভারতবাসীর জীবনে এই মহাযুদ্ধের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধের উপজাত হিসেবে সৃষ্ট নানা ঘটনা অবলম্বনে তৎকালের সাহিত্যিকেরা রচনা করেছেন অনেকগুলো কালোত্তীর্ণ ছোটগল্প। এসব সাহিত্যিকের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, এবং কলেরার মহামারী অবলম্বনে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলো অনন্য। সমকালে সংঘটিত এই ঘটনাগুলো অবলম্বনে তাঁর গল্প রচিত হওয়ায় এগুলো হয়েছে সমকালের প্রতিবেদন। গল্পগুলোতে তিনি যেমন সমকালের রূপায়ণ করেছেন, তেমনি রূপায়ণ করেছেন তাঁর কালের নেতিবাচক চরিত্রের মানুষদের এবং সন্ধান করেছেন শুদ্ধসত্তার, ব্যক্ত করেছেন মানবীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মার্কসীয় দর্শনজাত সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস এক্ষেত্রে তাঁকে সদর্থক জীবনবোধে উপনীত হতে সহায়তা করেছে।

এক

বাংলা সাহিত্যে 'সুনন্দ' ছদ্মনামে পরিচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) 'উত্তর কল্লোল পর্বের এক বিশিষ্ট গল্পকার' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ২২)। তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, যশস্বী অধ্যাপক, ছোটগল্পের তাত্ত্বিক, সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা এবং তাঁর সমকালের 'প্রতিনিধিস্থানীয়' (জগদীশ, ১৪২০ : ৫) শিল্পী। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বুর্জোয়া সমাজের চরম সঙ্কট' (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৩ : ৪৫), ভারতবর্ষে অহিংস ও সহিংস

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

আন্দোলনের চড়াই উৎরাই, সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে বিশ শতকের 'তিরিশের দশকের কনিষ্ঠতম কথাকার' (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ২৮৪) হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব এবং চল্লিশের দশকে সমাজসচেতন কথাশিল্পী হিসেবে 'মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর প্রকৃত বিকাশ' (জগদীশ, ১৪২০ : ৭)। নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯২২-১৯৮২), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) তিনি সার্থক উত্তরসূরি (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ২৮৪)। সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস, কালোবাজারি-চোরাকারবারিদের তাণ্ডব, বস্ত্রহীন বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আগস্ট আন্দোলন, কৌমজীবনের উচ্ছেদ সাধন, ধনতন্ত্রের ঝনৎকার – প্রতিটি মুহূর্ত ধরা আছে তাঁর গল্পে। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায়,

> ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চিৎকার মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজিমুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অত্যাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা; সারা বাংলার বুকে নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে ব'সে মুনাফাশিকারী ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধিলগ্নে যেন নরক গুলজার। (জগদীশ, ১৪২০ : ৭)

তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে ইতিহাসচেতনা, সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। সমাজবাস্তবতার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত ও তার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং শোষক-পীড়কদের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাঁর গল্পগুলোকে একটা তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

দুই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন। আসামের চা-বাগানের জন্যে কুলি সংগ্রহের কূটকৌশল, সমাজ বিমুখ ব্যক্তির হাড় বিলাসিতা, সুগার মিলের ম্যানেজারের নারী লোলুপতা, ধাওয়াদের বিপন্ন জীবন, শিকারি কর্তৃক মানব শিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার, নারীর সন্তানপ্রীতি, ইউরোপীয় যুবকের ভারতপ্রেম, ভণ্ড ব্রাহ্মণের নারী ব্যবসা, ভণ্ড পুরোহিতের কালীপূজা, প্রতিশোধপরায়ণা শিক্ষয়িত্রীর প্রতিশোধ, দম্পতির জীবনের ট্র্যাজেডি, ডুয়ার্সের জলঢাকা নদী তীরের কুমারীর প্রণয়, শিক্ষাতীর্থের অপ্রকৃতিস্থ শিক্ষক, অনাসক্ত ঐতিহাসিক এবং দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকালের চোরাকারবার, গুপ্তব্যবসা, মজুতদারি, বস্ত্রসংকট, ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়ক প্রভৃতি তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে। চলমান জীবন থেকেই তিনি তাঁর রচনার উপকরণ

আহরণ করেছেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর বেশির ভাগ গল্প রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি এবং কলেরার মহামারীর পটভূমিতে।[১] এ সম্পর্কে স্মর্তব্য লেখকের নিজের মন্তব্য :

> তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্যদিয়ে কঙ্কালের এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য গ্লানি আর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বাঙালী লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি, 'যুগান্তরে' লিখেছি 'নক্রচরিত', 'আনন্দবাজারে' লিখেছি 'দুঃশাসন', 'দেশে' লিখেছি 'পুষ্করা'। আরো অনেক গল্প – কিছু কিছু উপন্যাস। (সৌরভ ও পার্থপ্রতিম, ১৩৯৮ : ১৯)

অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পকার মনটিকে নানা ভাবে নতুন মাত্রায় চিহ্নিত করেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর ও গণবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে তিনি বিশুদ্ধ সময় চেতনা, জীবনপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসাকেই গল্পের মর্যাদায় দীপিত করেছেন। বর্তমান নিবন্ধ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন নয় বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধজাত পরিস্থিতি তাঁর গল্পে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা তাঁরই প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অন্বেষণের প্রয়াস এবং সেই সূত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ তথা বাংলায় যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পাশাপাশি সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মাঝে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা মাত্র।

তিন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, ম্যালেরিয়া-কলেরার মড়ক কীভাবে এসেছে তা বিশ্লেষণের পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ তথা বাংলায় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২১ বছর পরে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানি কর্তৃক পোলান্ডের ডানজিগ বন্দর আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূত্রপাত। 'প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা' (নরহরি, ১৯৭৮ : ২১৫) হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির অবমাননা, রাইন অঞ্চল দখল, ইতালি ও জাপানের সাথে সামরিক জোট গঠন এবং অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল, মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি সঞ্চয়জনিত ভীতি এবং 'পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতার সংকট দ্বন্দ্ব' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৪) প্রভৃতি ছিল যুদ্ধের আসন্ন কারণ। জার্মানি পোলান্ড আক্রমণ করলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, বিস্তার লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জার্মান বাহিনী ডেনমার্কের মধ্যদিয়ে

অগ্রসর হয়ে নরওয়ে দখল করে এবং হিটলার পূর্বচুক্তি ভঙ্গ করে হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গ দখল করেন। ১৯৪০-এর ১৪ই জুন জার্মান বাহিনী বিনা বাধায় প্যারিসে প্রবেশ করে। ২১শে জুন পরাজিত ফ্রান্স জার্মানির সাথে যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়। ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে ইতালি ও হাঙ্গেরিকে সঙ্গে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। রাশিয়া আক্রান্ত হবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অর্জন করে 'জনযুদ্ধের চারিত্র্য' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৪)। নরহরি কবিরাজের মতে, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যারা পরিচালনা করেছিল, তারা দুটি প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একটি প্রবণতার পৃষ্ঠপোষক ছিল উপরোক্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসকচক্র। অপর প্রবণতাটি পরিপুষ্ট হচ্ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে, যার লক্ষ্য ছিল এই যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করা' (নরহরি, ১৯৭৮ : ২১৬)। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল কালবিলম্ব না করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করেন। ৪১ সালেই জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যে 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় যার লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ। ঐ বছরই জাপান মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করলে, প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে। ফলে প্রথমে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, পরে তা-ই হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো স্পষ্টতই দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে : অক্ষশক্তি ও মিত্র শক্তি। অক্ষশক্তিতে অবস্থান করে জার্মানি, ইতালি ও জাপান; আর মিত্রশক্তিতে অবস্থান করে ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানি ক্রমাগত জয় লাভ করতে থাকে। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে জাপান সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, নিউগায়ানা ও আন্দামান দখল করে এবং চীন, থাইল্যান্ড ও ফরাসি ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তোলে। জাপানি বিমান কয়েকবার কলকাতার আকাশে বোমা বর্ষণ করে। কিন্তু যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক আক্রমণের ফলে জার্মানি, ইতালি ও জাপান হারতে শুরু করে। ১৯৪১-এর ৪ঠা জুন রোম মিত্রশক্তির অধিকারে আসে। ১৯৪৪-এর ২৫শে আগস্ট প্যারিস পুনরুদ্ধার করা হয়। ১৯৪৫-এর ২রা মে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করে এবং ৭ই মে জার্মান স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়। ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে শহর দুটি ধ্বংস করে দেয়। জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় এবং এরই মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও ভারত যেহেতু ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল, আর উপনিবেশগুলোর ভাগ্য যেহেতু ছিল গভীর ভাবে ঔপনিবেশিক

রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেইসূত্রে ভারতও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতকে 'যুদ্ধরত' (বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ২০০৪ : ১২৫) বলে ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ না থাকলেও স্বার্থ ছিল ব্রিটিশদের, কারণ নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে অক্ষত রেখে মহাযুদ্ধের বিপুল ব্যয় বহন করার জন্যে তাদের দরকার ছিল ভারতের মতো একটি সমৃদ্ধ উপনিবেশের। ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের মতে, 'যুদ্ধের এই সংকটময় মুহূর্তে ভারতের লোকবল, অর্থনৈতিক সম্পদ, ভারতের সামরিক সাহায্য ইঙ্গ মার্কিন যুদ্ধ জয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে' (নরহরি, ১৯৭৮ : ২২১)। এমন পরিস্থিতিতে উপনিবেশ ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করবে সেটাই স্বাভাবিক। পরিস্থিতি আরও শোচনীয় করে তোলে ১৯৪২ সালের মে মাসে জাপান কর্তৃক বার্মা দখল এবং ঐ বছরের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় জাপানি বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ। জাপান কর্তৃক বার্মা দখলের ফলে সেখান থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে '৪ লক্ষেরও অধিক' (বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড, ২০০৪ : ৫১৬) শরণার্থী স্থল ও জলপথে পূর্ববঙ্গ ও কলকাতায় আশ্রয় নিলে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৯৪২ সালের অক্টোবরে সংঘটিত সাইক্লোনে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালের বন্যা, অনাবৃষ্টি এবং ফসলে কীটের আক্রমণের ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে, দেশীয় ও এদেশে আগত বিপুল সংখ্যক বিদেশী সৈন্যের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। ফলে দেশে কৃত্রিম খাদ্যসংকট দেখা দেয়। অসাধু ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরাও খাদ্যশস্য গুদামজাত করে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক কন্ট্রোল-রেশনিং-কর্ডনিং প্রথা চালু এবং সকল প্রকার স্থল ও নৌযানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকায় খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্ডনিং প্রথার কারণে পাঞ্জাব থেকে গম ও আটা আমদানি করতে ব্যর্থ হওয়া, হিন্দু মহাসভাপন্থী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীবাস্তবের বিরূপতার কারণে ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে খাদ্য আনতে ব্যর্থ হওয়া, বিহার ও উড়িষ্যার সরকার কর্তৃক বাংলার সরকারকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার, সরকারি আমলাদের কর্তব্যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা – প্রভৃতি কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। অথচ পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার নিষ্ক্রিয়। ঐতিহাসিকদের মতে, 'বৃটিশ সরকার তখন সাম্রাজ্য রক্ষার চিন্তায় বিভোর, দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার মানুষের জীবনমরণ সমস্যা তখন তাদের নিকট গৌণ' (রহিম ও অন্যান্য, ২০০৫ : ৩৩৭)। পরিস্থিতির অবনতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে সরকার প্রবর্তিত 'খাদ্য রেশনিং' প্রথা।

এই প্রথাকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে চোরাকারবারি, মুনাফালোভী, কালোবাজারিদের খেলা। শাসকশ্রেণির সহায়তায় মধ্যবিত্ত সমাজের ভিতর থেকে একটা 'দালাল' শ্রেণি গড়ে ওঠে যারা মালিকদের কাছ থেকে কমিশন নেয়, আবার নিম্নবিত্তদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ভোগ ও শোষণ করতেও ইতস্তত করে না। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে :

> মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভারতে এত ব্যাপক মজুতদারি, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি ছিল না। ভারতীয় সমাজ জীবনে এটা ছিল মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিশাপ। সমাজের নৈতিক পতন ও দুর্নীতির আর একটা বড় দিক এই সময় থেকে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। (বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ২০০৪ : ১৩৬)

এসব ঘটনার ফলরূপে আসে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা বাংলা তেরশো পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর যা 'বাংলাদেশের পক্ষে শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কালিমালিপ্ত, শোচনীয়, বেদনাতুর ঘটনা' (সরোজ, ১৯৯৭ : ৬৭)। 'দুর্ভিক্ষ মাত্রই তীব্র এবং অশান্ত' (অমর্ত্য, ১৪১৮ : ১৪৪)। সমালোচক এই দুর্ভিক্ষকে নাৎসি বন্দি শিবিরের মতো 'বাংলায় গণহত্যার ফ্রন্ট' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৩) হিসেবে বিবেচনা করেছেন । দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে: উডহেড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ১৫ লক্ষ আর এসময়ে চোরাকারবারি, মুনাফালোভী, কালোবাজারিদের মুনাফার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা (Nehru, 1974 : 499)। অন্য মতে, এই সংখ্যা 'পঞ্চাশ লাখ' (রহিম ও অন্যান্য,২০০৫ : ৩৩৭) কিংবা 'ত্রিশ লাখ' (আজিজুল, ১৯৯৮ : ২৭৮)। তৎকালের এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প।

চার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি এবং কলেরা-মহামারীর প্রসঙ্গ এসেছে মূলত দুই ভাবে :

ক. প্রত্যক্ষভাবে গল্পের কাহিনি ও পটভূমি নির্মাণে, এবং

খ. পরোক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও জীবনযাত্রায় যুদ্ধের প্রভাবকে নির্দেশ করতে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি এবং কলেরা-মহামারী প্রত্যক্ষভাবে যে গল্পগুলোর কাহিনি ও পটভূমি নির্মাণ করেছে, সেগুলো হলো: 'হাড়' *(বীতংস);*

'কবর', 'তীর্থযাত্রা', 'লুচির উপাখ্যান', 'নক্র-চরিত' *(ভাঙা বন্দর)*; 'দুঃশাসন', 'কালোজল', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'খড়্গ' এবং 'ডিম' *(দুঃশাসন)*। নিম্নে গল্পগুলোতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি এবং কলেরার মড়কের চিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অপরিণামদর্শিতার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় সংঘটিত হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। 'হাড়' গল্পটি এই বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের আর্থ-সামাজিক পটভূমি অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের রূপায়ণে গল্পটি অনন্যসাধারণ। গল্পটিতে লেখক কৌশলে বিশ্বযুদ্ধ কালের নগর কলকাতার দুই ভিন্নধর্মী চিত্র অঙ্কন করেছেন। একদিকে বেকারত্ব, অনাহার এবং ভিক্ষাবৃত্তি অপরদিকে বিলাসী, আরামপ্রিয়, ধনী ব্যক্তির হাড় বিলাসের রূপায়ণ গল্পটিতে অভিনবত্ব এনেছে। গল্পটি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকালীন কলকাতার জীবন চিত্রের বাস্তব দলিল। গল্পটি আমাদের '১৯৪৩-৪৪ এ অঙ্কিত জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষ কেন্দ্রিক স্কেচগুলোর' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৫) কথা মনে করিয়ে দেয়।

চাকরির উমেদার এক বেকার যুবকের দৃষ্টিকোণে এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পীড়িত নগর কলকাতার ভয়াবহ বেকারত্ব সমস্যা ও জাপানি আক্রমণের ভয়ের চিত্র। গল্পটির কথক 'প্রমথর ছেলে' চাকরির উমেদারির জন্যে কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ এসেছে পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জির বাড়িতে। পিতৃবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই তার বর্ণনায় উদ্ভাসিত জাপানি বোমার ভয়ে ভীত কলকাতা নগরীর চিত্রঃ 'মাথার ওপর এরোপ্লেনের পাখার শব্দ – জাপানি-দস্যুর আক্রমণ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে' (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানি আক্রমণের ভয়ে ব্রিটিশ বিমান বাহিনী কলকাতার আকাশে যে পাহারা দিত, সেই কথাই কথকের জবানিতে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরেই কথক বর্ণনা করেছেন কলকাতায় আগত দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অবস্থা :

> একটু দূরে মনোহর পুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয় – বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। .. দেশ জোড়া ক্ষুধা যেন মা কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে – এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯১)

কথকের এই বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধকালীন সামাজিক বৈষম্য গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। লোহার ফটক, অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেলে বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচের জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড আর গ্রান্ডিফ্লোরার সুরভি সমৃদ্ধ

রায়বাহাদুর সাহেবের অভিজাত বাড়ির বর্ণনার বিপরীতে মনোহরপুকুর পার্কের বুভুক্ষুর কলোনি, কালো জিভ দিয়ে হাইড্রেনের ময়লা জল চাটা, একমুঠো ভাত কিংবা এক খাবলা বজরার জন্যে আর্তনাদ, হানাহানি – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতারই বাস্তবতা। জীবনানন্দ দাশের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রি' কবিতায়ও আমরা অনুরূপ বর্ণনা পাই–

'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে।' (তপন, ২০০০ : ১৮০)

অতঃপর চাকরির উমেদার কথক প্রবেশ করেন পিতৃবন্ধুর আলয়ে। কথকের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে রায়বাহাদুর সাহেব তাকে সামরিক বাহিনীর চাকরিতে যোগদানের উপদেশ দেন এভাবে– 'চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম. এ. পাস করে কেরানী গিরির উমেদারী করছ? বী এ ইয়ং ম্যান ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে। চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে' (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৩)। চরম অভাবে নিপতিত বেকার যুবককে কেরানির চাকরির পরিবর্তে অ্যাকটিভ সার্ভিসে যোগদানের পরামর্শ দেয়ার মধ্যে রায়বাহাদুর সাহেবের আকাশ-কুসুম কল্পনাপ্রবণতা, বাস্তব জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বুর্জোয়া মানসিকতাকেই নির্দেশ করে। রায়বাহাদুর সাহেবের মুখে সামরিক বাহিনীতে চাকরির কথা শুনে কথক যে স্বগতোক্তি করেছে তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার ছবি স্পষ্ট :

> যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোট বিঘ্নিত ফেনিল সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাকে কবি কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। ... আর বোমারু ঈগলের মৃত্যু চঞ্চুর তলায় দূরবীনের শাণিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রতীক্ষা করা – আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে। (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৩)

–উদ্ধৃতিটিতে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ যেমন : 'সাইরেন', 'ইউ-বোট', 'বোমারু ঈগল', 'দূরবীন', 'অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট' প্রভৃতি শব্দ প্রবলভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেই সূচিত করে।

গল্পের রায়বাহাদুর বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি। সে সম্পূর্ণ বিলাসী, আরামপ্রিয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং আত্মপ্রচারে উন্মুখ। তিনি কথককে হাড়ের সংগ্রহ দেখান, যা তিনি সংগ্রহ করেছেন তার পেশাজীবনের সমস্ত সময় ধরে। কথককে হাড়ের সংগ্রহ দেখানোর সময় বুভুক্ষু মানুষের চিৎকার শুনে রায়বাহাদুর সাহেবের মন্তব্য : 'পার্কের ওই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধ হয় খাবার দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না

পেলে চিৎকার করবে খেতে পেলেও তাই' (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৪)। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষগুলো সম্পর্কে রায়বাহাদুর সাহেবের এরূপ উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তার অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পরিচায়ক। সমালোচকের মতে,

> যুদ্ধ-মন্বন্তর পীড়িত বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠলেও উচ্চবিত্ত মানুষের লোভ ও নীচতা, দুর্গত মানুষের অসহায়তা আগেও ছিল। কিন্তু এভাবে ছোটগল্পকারের জিজ্ঞাসু অঙ্গুলি নির্দেশের সম্মুখীন হয়নি। এভাবে ছোট গল্পের অঙ্গ ও অঙ্গীরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। (উত্তম, ১৪২১ : ২৭৭)

এসবের পাশাপাশি কথক গল্পের মাঝে মাঝে কিছু বাক্য ব্যবহার করেছেন যা দুর্ভিক্ষের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। যেমন: 'চাট্টি ভাত দাও গো মা – একটু খানি ফ্যান–' (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৬)। –'চাট্টি ভাত' কিংবা 'একটু খানি ফ্যান'-এর জন্যে প্রার্থনা মন্বন্তরকালীন বাস্তবতা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পার্থক্য' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পেও আমরা অনুরূপ প্রার্থনার পরিচয় পাই – 'লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল– একটু ফ্যান দাও বাবা – বড্ড খিদে পেয়েছে–' (বিভূতিভূষণ, ৫ম খণ্ড, ২০০৫ : ৪১১)। 'মা–গো, চাট্টি খেতে দাও' (হায়াৎ মামুদ, ২০১১ : ৬)।

রায়বাহাদুর সাহেব ও কথকের আলোচনার মাঝে নাশতা আসে। দুজনেই তা গ্রহণ করেন। মার্জিত, সংযত, আর ভদ্রভাবে মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে খাওয়ার সময় কথকের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে বুভুক্ষুদের খাওয়ার চিত্র। উচ্চবিত্ত এবং মন্বন্তর পীড়িত মানুষের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার এই বৈপ্যরীত্যকে তুলে ধরে কথক এখানে বিত্তবানদের তথাকথিত 'খাদ্যগ্রহণের শোভন প্রক্রিয়া'কে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন–

> দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে দিয়ে যেমন করে সচিৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে। (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৫)

চাকরির উমেদারিতে ব্যর্থ হয়ে কথক রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ব্লাক আউটের আলোহীন পথে। জাপানি বিমান হামলার ভয়ে ব্লাক-আউট ছিল কলকাতার প্রাত্যহিক বাস্তবতা। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে, '১৯৪১ সালের বর্ষাকাল থেকেই কলিকাতায় ব্লাক আউট এবং এ-আর-পি'র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং মহাযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত অসামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল' (বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ২০০৪ : ৫১৮)। ব্লাক আউটের আলোহীন পথে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কথক দেখতে পান রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের খাদ্য অন্বেষণের চিত্র : 'সামনে

ডাস্টবিন। তিন-চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি – নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভীড়বার ভরসা পাচ্ছে না।' (নারায়ণ, ১৪০৫ : ২৯৭)

গল্পের কথক চাকরির উমেদারির জন্যে রায়বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে একদিকে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পীড়িত বুভুক্ষু জনগোষ্ঠীকে এবং অন্যদিকে বিত্তবান ব্যক্তির হাড়প্রীতি, উন্নাসিকতা ও সমাজবিমুখতাকে। লক্ষণীয় যে, এই বৈপরীত্য কথককে 'বিক্ষুব্ধ ও যন্ত্রণা দিয়েছে সত্য কিন্তু বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার মানসিক প্রস্তুতি দেয়নি' (সিরাজ, ২০০৬ : ১৩০)। তবে গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজাতীয় বেদনাবোধ সর্বদা তার ভিতরে সক্রিয় থেকেছে। গল্পের মূল দ্বন্দ্বের জায়গা এটি। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় যে, কথক নতুন দিনের সম্ভাবনাকে অর্থাৎ সমাজবদলের ঝড়কে আহবান করেছেন কিন্তু কবে সে ঝড় আসবে তার ইঙ্গিত দিতে পারেননি।

'হাড়' গল্পটির বয়নকৌশল অতি সূক্ষ্ম এবং 'আবেদনও আরো ব্যঞ্জনাময়' (জগদীশ, ১৪২০ : ৯)। গল্পটির নামকরণের মধ্যেও গভীরতম অর্থব্যঞ্জনা নিহিত। একদিকে দুর্ভিক্ষে ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত কলকাতার বিপন্ন পরিবেশে অনাহারী, অর্ধমৃত, মুমূর্ষু, মৃত মানুষের হাড়ের ছড়াছড়ি অপরদিকে অভিজাত বাড়ির পরিবেশে রায়বাহাদুর সাহেবের হাড়- বিলাসিতা গল্পের নামকরণে অভিনব ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে। আবার গল্পে ব্যবহৃত 'মন্ত্র' শব্দটিও দ্বি-মাত্রিক। রায়বাহাদুর সাহেবের কাছে 'মন্ত্র' 'কত কী অঘটন ঘটিয়ে' ফেলানোর শক্তি; আর অন্নহীন, অসহায়, শোষিত মানুষের কাছে 'মন্ত্র' হচ্ছে 'বিপ্লবের দীক্ষা'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি, চোরাকারবারি ও মজুতদারির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কবর' (১৩৫১) গল্পে। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কালোবাজারি, চোরাকারবারি ও মজুতদারি কীভাবে একজন বিত্তহীন ব্যক্তিকে বিত্তবান ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে তারও কথকতা এই গল্পটি।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শা-নওয়াজ। সে কালোবাজারি। এই যুদ্ধের বাজারেও সে পাঁচগুণ দাম দিয়ে এবং বহু সন্ধান করে নতুন গাড়ি কিনেছে । মডেল নাইন্টিন ফোরটিফোর। অথচ যুদ্ধের আগে তার কিছুই ছিল না। 'ফিল্মের রিলের মতো ফ্লাশ ব্যাকে' (উত্তম, ১৪২১ : ১৫৯) সে বলে চলে তার উত্থানের গল্প। ছোটবেলায় তার বাবা মারা গিয়েছিল। তার মা মোড়লের বাড়িতে কাজ করে তাকে মানুষ করেছে। লেখাপড়ায় সে খারাপ ছিল না। মাইনরে বৃত্তিও পেয়েছিল কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করতে

পারেনি। চুরির দায়ে একদিন তার মা মোড়লের বাড়ি থেকে প্রহৃত হয়ে এলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল মোড়লের ছেলেকে, কিন্তু পারেনি। হত্যা চেষ্টার অপরাধে সে তিন মাস জেলও খেটেছিল। জেল থেকে বের হয়ে এসে সে গ্রাম ত্যাগ করে ভিড়েছিল উত্তরপাড়ার চটকলে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় হারিয়েছিল চাকরি। এরপর সে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় খাতা লেখার চাকরি নিয়েছিল চিৎপুরের হোটেলে, মনোহারির দোকান দিয়েছিল ক্যানিংস্ট্রীটে কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। তার ভাগ্য পরিবর্তন করেছে বিশ্বযুদ্ধ আর পঞ্চাশের মন্বন্তর। যুদ্ধের বাজারে একসঙ্গে টান পড়েছিল সব কিছুরই। তাই সে নিয়েছিল কন্ট্রাক্ট; সি.পি.র জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে আনার আর ধান-চাল কেনার কন্ট্রাক্ট। এই কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্যে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়িয়েছে বড়বাজারে, ডালহৌসি স্কয়ারে, শেয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনে, মিলিটারিদের হেডকোয়ার্টারে। কন্ট্রাক্টের ব্যবসাতেই সে হয়ে গেল লাল। তার ভাষায় :

> –হ্যাঁ লাল হয়ে গেলাম – একধার থেকে পারচেজ করতে লেগে গেলাম, রাশি রাশি মিথ্যে কথায় ঠকালাম নিজেকে, নিজের দেশের লোককে। আর পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্তমাখা-টাকায় বাড়ি কিনেছি, গাড়ি কিনেছি। কলকাতার রাস্তায় পায়ের নিচে মাড়িয়ে গেছি মড়া। ভাতের ফ্যানের জন্য যখন জীবনের অপমান তার কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে দুয়োরে দুয়োরে কেঁদে বেড়িয়েছে, তখন দামী দামী খাবার কিনে কুকুরকে খেতে দিয়েছি, মানুষকে নয়। মানুষ হাত পাতলে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৫)

মানুষকে চাবুক মেরে শা-নওয়াজ তাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। দুর্ভিক্ষে ৫০ লাখ লোকের মৃত্যুর পরও তার প্রতিশোধস্পৃহা মেটেনি। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময়ও সে মানুষকে চাপা দিতে চায়। মানুষের ওপর সে কতটা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে তাই দেখতে গাড়ি চালিয়ে সে চলেছে গ্রামে। গ্রামের প্রবেশ মুখে সে মোড়লের যে জরাজীর্ণ বাড়ি দেখতে পেয়েছে, তা শুধু মোড়লের বাড়ির ছবি নয়, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পীড়িত আবহমান বাংলার ছবি :

> সামনেই বড় একটা খামার বাড়ি। শূন্য গোলা, ওপরের খড় ঝরে পড়ছে। দু'তিনটে বড় বড় ঘর মাটিতে লুটোবার উপক্রম করছে। বিষণ্ন আম বাগানের ছায়ায় যেন মৃত্যুর মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে সমস্ত। শুধু কোথায় যেন ঘু ঘু করছে – ক্লান্ত আর করুণ একটানা স্বর। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৬]

মোড়লের জরাজীর্ণ বাড়ি দেখে তার আত্মস্বীকারোক্তি: '... কিছু আর বাকি নেই। মন্বন্তর এদের শেষ করে দিয়েছে, এদের চাল কিনে আমি বিক্রি করেছি চোরাবাজারে' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৬)। শা-নওয়াজ প্রতিশোধ যথার্থভাবেই নিয়েছে। তার প্রতিশোধস্পৃহার ফলেই মৃত্যুবরণ করেছে গ্রামের সব মানুষ। তার প্রতিশোধের ফলই তার গাড়ির গতি রোধ করে দিয়েছে। কারণ সামনে আর পথ নেই, সব কবর: 'হ্যাঁ,

কবর – রাস্তা ঘাট সব জুড়ে কবর দিয়েছে, ... তাই বাংলাদেশের মানুষ বাংলার পথে ঘাটে সব জায়গাতেই ছড়িয়েছে মৃত্যু শয্যা।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৭)

'তীর্থযাত্রা' (১৩৫২) গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে নারীব্যবসা অবলম্বনে রচিত। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত: 'সমকালে নারী যেভাবে পণ্যে পরিণত হয়েছিল তারই অনবদ্য চিত্রণ এই গল্প'(উত্তম, ১৪২১ : ২৫২)। গল্পের শুরুতেই রয়েছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের আগমন বার্তা: 'কিন্তু তেরশো পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে – মেঘনার উত্তর দিগন্তে মহানাগের বিষ নিঃশ্বাসের মতো। এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৮)

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের এই আগমন পরিবর্তন নিয়ে এসেছে নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসায়। যাজন-যজন তার পৈতৃক ব্যবসা হলেও সে এখন নারী ব্যবসায়ের দালাল। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের যজ্ঞে সে নৌকায় ভরে নিয়ে চলেছে নারীমেধের পসরা। লেখকের ভাষায় : 'যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসা, নতুন কালের হাওয়ায় তার রূপান্তর ঘটেছে। পাঠার নৌকায় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রি করতে চলেছে শহরে।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৭৯)

ব্রাহ্মণ হয়েও নরোত্তমের নারী ব্যবসায়ের দালাল হিসেবে নিযুক্ত হওয়া সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক। তবে নরোত্তমের দৃষ্টিতে এটা ব্যবসা নয়, মানবসেবা; তীর্থযাত্রা। তাই সে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, মহামায়ার প্রকোপে পড়া তের থেকে ত্রিশ বছর বয়সের একদল নারীকে নিয়ে বেরিয়েছে দেবতা দর্শনের উদ্দেশে অর্থাৎ তীর্থযাত্রায়; কিন্তু তার লক্ষ্য শহরের গণিকাপল্লিতে এদের চালান করা। তবে নরোত্তমের দেবতারা স্বর্গের দেবতা নয়, এরা একান্তভাবেই মর্ত্যবাসী। যুদ্ধের কন্ট্রাক্টের টাকায় এরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে; প্রতিষ্ঠা করেছে দেবতা কুবেরের আলয় অর্থাৎ গণিকাপল্লি। যাকে বলা যেতে পারে নারী মাংসের কসাইখানা। আর এই পূজা মণ্ডপে নতুন কালের নতুন বলি হয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে পীড়িত বাংলার নারীরা। তীর্থদর্শনের নামে নরোত্তম দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম থেকে নারীদের সংগ্রহ করে বিক্রি করতে চলেছে সেই গণিকাপল্লিতে। লেখকের ভাষায় : 'এখানে মড়কে জর্জরিত বাংলার বুক থেকে গৃহচ্যুত গৃহলক্ষ্মীরা পণ্য হতে চলেছে শহরের গণিকাপল্লিতে। ... ভিখারী মহেশ্বরের গৃহিণী আজ কুলত্যাগিনী।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৮৩)

কিন্তু নারী ব্যবসার দালাল ব্রাহ্মণ নরোত্তমের কাছে এ এক মহা ঝকমারির কাজ; পুরোপুরি পরোপকার। ব্রাহ্মণ হয়েও নারী ব্যবসার দালালি করতে তার বাধে না; কেননা তার কাছে, ব্যবসা ব্যবসাই, তার ওপরে কারো কোনো কথা চলে না। সে অন্যদের নিয়ে ভাবে না। তার দৃষ্টিতে মন্বন্তরে গাঁয়ে পড়ে থেকে না খেয়ে মরে

আত্মসম্মান রক্ষার চেয়ে শহরের গণিকালয়ে গিয়ে খেয়ে সম্মান হারানো শ্রেয়। লেখকের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে নরোত্তমের দৃষ্টিভঙ্গি :

> দেশ-গাঁয়ে পড়ে থেকে ভিটে কামড়ে মরে যাচ্ছিল সমস্ত, তার চাইতে এ সহস্র গুণে ভালো। তাসের ঘড়া সংসার তো দুর্ভিক্ষের একটা দমকাতেই ভেঙে পড়েছে। ঠুনকো আত্মসম্মান; পেটে ভাত না পড়লে যে তার এতটুকুও দাম নেই; এ সত্য নরোত্তম ভালো করেই জানে। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৮০)

নরোত্তমের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ভণ্ড মানসিকতা যেমন প্রকাশিত তেমনি প্রকাশিত মন্বন্তরে পর্যুদস্ত বাংলার পরিবারগুলোর ভাঙনের চিত্র। তবে গল্পটিতে লেখক দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে গল্পের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছেন। নৌকার মাঝি ফরিদ দেখতে কুৎসিত কিংবা ভয়ংকর হলেও মনের দিক থেকে সে অনেক উঁচু স্তরের। বিবেকের কাছে ও মনের দিক থেকে সে অনেক সৎ। কিন্তু নরোত্তম নামে নরোত্তম হলেও কর্মের দিক থেকে সে নিকৃষ্টতম নর। তার নামের মধ্যেই তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কূটাভাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট মন্বন্তরের সময়ে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বাজারে দেখা দেয় চালের সঙ্কট। অধিকাংশ চালই চলে যায় মাটির নিচে অর্থাৎ চোরাবাজারে। এ সময়ে ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার আশায় চালে মেশানো শুরু করে কাঁকর। দুর্ভিক্ষের বাজারে চালের সাথে কাঁকর মিশিয়ে কিংবা চালে মেশানোর জন্য কাঁকর সরবরাহ করে কীভাবে এক ব্যক্তি ধনী হয়ে ওঠে তারই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে 'লুচির উপাখ্যান' গল্পে। পুত্রের গৃহশিক্ষকের সঙ্গে ফেল করা পুত্রের পিতা সিদ্ধেশ্বর বাবুর কথোপকথন সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে চালে কাঁকর মেশানোর ইতিবৃত্ত। 'পুরো গল্পটাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোরাকারবার ও ভেজালের পটভূমিকাকে মনে করে লেখা হয়েছে' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৪৯)।

গল্পের কথক রঞ্জনবাবু। তার ছাত্রের পিতা সিদ্ধেশ্বরবাবু খাঁটি ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার বদলে লেখাপড়া শেখাকে তিনি অর্থের অপচয় বলে মনে করেন। তেলের কল, আটার কল সহ আরো অসংখ্য কাজ-কারবারের মালিক তিনি। সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদে তার খেরো খাতার কালো কালো অঙ্কগুলো ব্যাংক নোট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ। একটি পয়সা অপব্যয় করতে গেলে তার বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে। তবে তিনি আজ অত্যন্ত খুশি; ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে তার পরেও তিনি খুশি। কারণ যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি, মজুতদারি এবং চালে মেশানো কাঁকর সরবরাহ করে তিনি অনেক উপার্জন করেছেন। প্রায় দশ লাখ। ছাত্রের শিক্ষকের কাছে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : '–হ্যাঁ – বিশুদ্ধ কাঁকর। ধান নয়, চাল নয় – অকেজো

কচকচে কাঁকর। আর এই কাঁকরের টাকাতেই দমদমে আমি দু খানা নতুন বাড়ি কিনেছি।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৯৮)

–উদ্ধৃতিটিতে সিদ্ধেশ্বর বাবুর উক্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে যুদ্ধই বদলে দিয়েছে তাঁর ভাগ্যকে। যুদ্ধের বদৌলতে তিনি ধুলোকে সোনা করেছেন আর কাঁকরকে পরিণত করেছেন টাকায়। প্রচুর কাঁকরের অর্ডার তিনি পেয়েছিলেন চালে মেশানোর জন্যে, সরবরাহও তিনি করেছিলেন। তার উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে কাঁকর ব্যবসার ইতিবৃত্ত :

> প্রচুর কাঁকরের অর্ডার তারা দিয়েছিল – পাঁচ মণ, দশ মণ, পাঁচশো মণ। ... হাজার হাজার মণ। নৌকোয় বোঝাই হয়ে এসেছে, লরীতে বোঝাই হয়ে এসেছে, তারপর চালের সঙ্গে মিশে গেছে কলকাতার দোকানে দোকানে, গেছে বাংলাদেশের শহরে গ্রামে। এক মণ চালের সঙ্গে তিন সের কাঁকর গৃহস্থের পেট ভরিয়েছে, ব্যবসায়ীর পকেট ভরিয়েছে। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৯৯-২০০)

কাঁকর সরবরাহের পাশাপাশি চালে কাঁকর কীভাবে মেশানো হয় সেই প্রক্রিয়ার কথাও বলেছেন তিনি :

> ভাতে যে কাঁকর আপনারা খান, তা নিতান্তই অ্যাকসিডেন্ট নয়, বাড়তি ফসলের মতো ধান ক্ষেত থেকে উঠেও আসেনি। বহু খরচ করে লরি বোঝাই দিয়ে তা আমদানি করতে হয়েছে, অনেক হিসেব করে, অনেক যত্ন করে তাকে চালের সঙ্গে মিশাল দিতে হয়েছে। ভগবানের কোনো কাজ-কারবার নেই এখানে, মানুষের কেরামতিই ষোলো আনা। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৯৯)

যুদ্ধের বাজারে চোরাকারবারি ও কালোবাজারিরা মুনাফা অর্জনের জন্য যে কী হীন পন্থা অবলম্বন করতে পারে তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত এই গল্পটি।

'নক্র-চরিত' (১৩৫০) গল্পটিও 'লুচির উপাখ্যান' গল্পের মতোই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে মজুতদারি ও কালোবাজারির ঘটনা অবলম্বনে রচিত। 'মুনাফালোভী মজুতদার ও কালোবাজারির দৌরাত্ম্যে যে দুর্ভিক্ষ ও মানবীয় অপচয় তারই সময়সচেতন শিল্পরূপ' (লুৎফর, ২০০৪ : ১১৫) এই গল্পটি। পাশাপাশি 'পুলিশ-ব্যবসায়ী-অপরাধী আঁতাতে সামাজিক জীবন কীভাবে পূতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে তারই ইঙ্গিত রয়েছে গল্পের পরতে পরতে' (উত্তম, ১৪২১ : ২৬৭)। ডাকাত ও মজুতদারের সঙ্গে প্রশাসনের গভীর আঁতাতের চিত্র গল্পটিতে অভিনবত্ব এনেছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পরম বৈষ্ণব নিশিকান্ত কর্মকার। তার অর্থলোভ সীমাহীন। সে যেমন লোভী, তেমনই ধূর্ত। সে মজুতদার, জাঁদরেল মহাজন। শুধু সোনাদানা নয়, তার রয়েছে ধান-চালের আড়ত, কাটা কাপড়ের ব্যবসা। ডাকাতি করা স্বর্ণের সে বড় ক্রেতা এবং সেই স্বর্ণ দ্বারা তার লৌহসিন্দুক পূর্ণ। গোলাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সে প্রেসিডেন্ট। সদর থেকে ছাপানো সব কাগজ তার নামে আসে। হবিবগঞ্জ থানার

দারোগা 'ভুঁড়ো কুমির' ইব্রাহিম মিঞা তার বশীভূত, ফলে পুলিসের হাঙ্গামা থেকে সে মুক্ত। দুর্ভিক্ষের সময় যখন চাল পাওয়া যাচ্ছে না তখনও তার গুদামে মজুদ করা রয়েছে আটশো মণ চাল। বারো টাকা দরে যে চাল কেনা ছিল বর্তমানে বর্ষার বাজারে তার দাম বেড়ে হয়েছে চল্লিশ টাকা। মণ প্রতি আটাশ টাকা লাভ। স্মর্তব্য তার উক্তি :

> আটশো মণ চাল সে মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাল নয় – রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল – মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয় তো এই'ই সুযোগ। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২১৭)

কিন্তু গোলাঘরের টিনের চাল চুইয়ে পানি এসে নষ্ট হয়ে গেছে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মণ চাল। অথচ চালের অভাবে দুর্ভিক্ষে খেতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তারই গ্রামের মতি পাল ও মতি পালের স্ত্রী। চৌকিদারের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে সেকথা: 'আগে ভিক্ষে করত, তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন? বৌটাও আর পেটের জ্বালা সইতে পারেনি, তাই গলায় দড়ি দিয়েই ঝামেলা মিটিয়েছে' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২১৫)। শুধু মতি পালের পরিবারই নয়, দুর্ভিক্ষে গ্রামের যা অবস্থা তাতে সত্বরই মারা যাবে গ্রামের অনেক মানুষ। লক্ষণীয় নিশিকান্তের প্রতি চৌকিদারের উক্তি: 'শুধু এই বাড়িই নয় বাবু। এরকম চললে দু'মাসে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে! দেখুন না, দু-তিন দিনের মধ্যে আরো পাঁচ সাতটা মরার খবর–' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২১৫)।

নিশিকান্তের মজুতদারির ফলেই যে গ্রামের মানুষগুলো আজ অসহায়ের মতো মৃত্যুর প্রহর গুনছে, উদ্ধৃতিটিতে সে বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু নিশিকান্ত মনে করে না যে, তারই লোভের কারণে মরছে এই মানুষগুলো। পরম বৈষ্ণব নিশিকান্তের মনে হয়, এসব ওদের নিজেদের কৃতকর্মের ফল; পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা। কিন্তু নিশিকান্তই যে প্রকৃত অপরাধী, ছায়ামূর্তিগুলোর আর্তনাদে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত: 'আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার খত, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু – এখন?' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২১৫)

গল্পে দেখা যায় যে পরম বৈষ্ণব নিশিকান্ত তার সেবাদাসী হিসেবে রেখেছে 'হাড়ির মেয়ে' কষ্টবালাকে। আদর করে সে কষ্টবালার নাম রেখেছে বিশাখা। বিশাখা একদিকে তার সেবাদাসী অপরদিকে পুলিশসহ আনুষঙ্গিক বিপদ সামলানোর মোক্ষম এক জীবন্ত দাওয়াই; অর্থাৎ 'বিশাখা নিশিকান্তের ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু' (উত্তম, ১৪২১ : ১৬৪)। বিশাখাকে দিয়েই সে বশ করেছে ইব্রাহিম মিঞা দারোগাকে। ইব্রাহিম মিঞা দারোগার আশ্রয়ে থেকে নিশিকান্ত নিশ্চিন্তে চালিয়ে গেছে মদন ডাকাতের কাছ থেকে

ডাকাতির মাল কেনা ও মজুতদারির ব্যবসা। মদন ডাকাত, নিশিকান্ত ও ইব্রাহিম মিঞা দারোগার সম্পর্ক দেখে মনে হয়, ডাকাত পুলিশ প্রশাসন ও মজুতদার যেন একে অপরের পরিপূরক। সমালোচক তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রে যে দুর্বৃত্তায়ন তার যোগসূত্র রচিত হয় মদন ডাকাত-নিশিকান্ত মহাজন-ইব্রাহিম দারোগার মাধ্যমে।' (লুৎফর, ২০০৪ : ১১৬)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে যুদ্ধের একটি অন্যতম উপজাত (by-product) হিসেবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বাজারে দেখা দেয় বস্ত্রসংকট। চোরাকারবারি ও কালোবাজারি এক শ্রেণির ব্যবসায়ী এই বস্ত্রসংকটের মূল কুশীলব। 'দুঃশাসন' (১৯৫১) গল্পটি বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতের তথা বাংলার বস্ত্রসংকট অবলম্বনে রচিত। 'গল্পটিতে রয়েছে যুদ্ধের বাজারে বস্ত্র সংকটের নির্মম বাণীরূপ' (উত্তম, ১৪২১ : ১৬৩)। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের সংকট কি নির্মমরূপে দেখা দিয়েছিল, তারই কাহিনী এটি। মহাভারতের দুঃশাসন চরিত্রটি যে নির্লজ্জ পাশবিকতার প্রতীক হয়ে আছে, তাকেই এখানে প্রতীকী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৫৯)। মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায় কৌরব দুঃশাসন হরণ করেছিল দ্রৌপদীর বস্ত্র আর দুর্ভিক্ষের সময় আমরা দেখতে পাই এই মজুতদাররাই হরণ করেছে বাংলার দ্রৌপদী রূপী অসংখ্য নারীর বস্ত্র। গল্পকার পৌরাণিক কাহিনিকে এই গল্পে সমকালীন বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

গল্পের মূল চরিত্র ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরের বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। কাপড়ের আড়তদার সে। খুচরা ও পাইকারি সহ সব ব্যবসাই তার চলে। আশপাশের আট-দশ খানা হাট তারই অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এবার তাকে মুষ্টি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করতে হয়েছে; কারণ যুদ্ধের বাজারে কাপড়ের চালান নেই, গুদাম খালি। আর যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় তা সরকারি দামে বিক্রি করা যায় না। তাই সে শুরু করেছে কাপড়ের মজুতদারি। অথচ কেউ কাপড় কিনতে আসলে কাপড় না থাকার কারণ হিসেবে সে বলে : 'সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২২৬)। স্বীয় অপকর্মের দায় ভগবানের ওপর চাপিয়ে নির্বিঘ্নে কাপড়ের কালোবাজারি করে সে। মামলার জট থেকে মুক্তি পেতে দারোগা শচীকান্তকে চমৎকার আদ্দি উপঢৌকন দিতেও সে দরাজ-হস্ত– 'যুদ্ধের বাজারে চমৎকার আদ্দি কোথায় পাওয়া গেল – সে রহস্য দেবীদাস জানে। একটা প্রোফিটিয়ারিংয়ের মামলার জাল কেটে বেরুতে একখান আদ্দি খরচ করতে হয়েছে।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২২৯)

দুঃশাসন রূপী দেবীদাসের কাছ থেকে চমৎকার আদ্দি পেয়ে দারোগা শচীকান্ত বস্ত্রাবৃত হলেও দেবীদাসের মুনাফালোভী কর্মকাণ্ডের ফলে বস্ত্রহীন হয়েছে দ্রৌপদী রূপী বাংলার

নারীরা। মহাভারতের দুঃশাসন কেড়ে নিয়েছিল দ্রৌপদীর বস্ত্র আর এ যুগের দুঃশাসন দেবীদাস কেড়ে নিয়েছে বাংলার অসংখ্য নারীর বস্ত্র। গল্পে 'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রা দেখে ফেরার পথে মুচিপাড়ায় দেবীদাস ও গৌরদাসের দেখা নগ্ন মেয়েটি তাদেরই পাশব কর্মের নির্মম বলি: 'মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোন খানে এক ফালি কাপড় নেই – কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৩২)

বস্ত্রসংকটের পাশাপাশি যুদ্ধের সময় দেখা দেয় কেরোসিন তেলের সংকট। গল্প পাঠে দেখা যায় তেলের অভাবে আলো না থাকায় মুচি পাড়ার একটি মেয়ের শিশুপুত্রকে ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে নিয়ে গিয়ে খেয়েছে বাড়ি থেকে ত্রিশ হাত দূরে, কিন্তু আলোর অভাবে অন্ধকারে তারা তা দেখতে পায়নি। অথচ যাত্রাপালার জন্য পাঁচ-পাঁচটা ডে-লাইটের ব্যবস্থা করেছে দারোগা শচীকান্ত। এমনি একটা বৈপরীত্যকে লেখক তুলে ধরেছেন গল্পে। পাশাপাশি লক্ষণীয় এই গল্পে যাত্রাপালার ভূমিকা। 'নক্রচরিত গল্পে কীর্তনের ভূমিকা আর এই গল্পে যাত্রাপালার ভূমিকা একই' (উত্তম, ১৪২১ : ২৫২)। সমালোচকের মতে, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহারী দুঃশাসনের নিধন প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত যাত্রার অভিনয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুধু দেবীদাসের মানস প্রতিক্রিয়াই নয়, পাঠকের মনেও এর ফলশ্রুতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে'। (জগদীশ, ১৪২০ : ৮)

গল্পটিতে পুলিশের ভূমিকাও লক্ষযোগ্য। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কিংবা তার পরবর্তীকালেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এই বাহিনীটির ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দিত। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অনাচার, বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত থাকলেও প্রায়শই তারা ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী এবং সমাজের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ডের গোপন ইন্ধনদাতা। এ কারণে আমরা দেখি 'দুঃশাসন' গল্পের দারোগা শচীকান্ত, এল. সি. কানাই দে এবং 'নক্রচরিত' গল্পের ইব্রাহিম দারোগা একই স্বভাবের। তারা 'সব কটা ডাঙার কুমির। টাকারও বটে'। (উত্তম, ১৪২১ : ১৬৩)

'দুঃশাসন' গল্পের নামটি রূপকাশ্রয়ী এবং দ্বি-মাত্রিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ। 'দুঃশাসন' নামটি দ্বারা পৌরাণিক চরিত্র 'দুঃশাসন'কেও নির্দেশ করা যায় আবার 'অপশাসন বা খারাপ শাসন'কেও নির্দেশ করা যায়। তবে গল্পের সমগ্র পরিসরে পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে যাত্রা পালার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গল্পকার যেমন যুগের দুঃশাসনকে বোঝাতে চেয়েছেন তেমনি মানবসৃষ্ট অবক্ষয়কেও সূচিত করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি তিনি সর্বকালের অপশাসনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সাধারণ জনগণ-ই যে এই অপশাসনকে উৎখাত করবে – গল্পের সমাপ্তিতে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার।

বস্ত্রসংকট অবলম্বনে লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি গল্প 'ইজ্জৎ'। গল্পটিতে লেখক বস্ত্রসংকটকালীন বাংলার দুটি বিষয়কে রূপায়িত করেছেন। সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে কাজে লাগিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে কীভাবে অন্যের সম্পদ দখল করতে চায় তার পরিচয় যেমন এই গল্পে আছে, তেমনি মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে উপনীত হয়ে বস্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি কীভাবে মৃতের গায়ের বস্ত্র চুরি করতে উদ্যত হয় তারও বর্ণনা আছে এই গল্পে।

গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় যে, 'নিদ্রিত প্রবাল দ্বীপের' মতো গ্রামটিতে 'ফকিরের আস্তানা' ও 'ডাকাত কালীর থান' দীর্ঘদিন ধরেই সম্প্রীতির সাথে অবস্থান করছিল। কিন্তু কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের দাঙ্গার ঝড়ো হাওয়া এই দ্বীপটিকে আলোড়িত করে। সেই আলোড়নে নতুন মাত্রা যোগ করে মৌলবীর ওয়াজ। এতে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই বিভক্ত হয়ে পড়ে। জটিলতা তৈরি হয় 'ডাকাত কালীর থানে'র পুজোর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দলনেতা ধলা মস্তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের দলনেতা জগন্নাথ ঠাকুরকে হুমকি দেয় এই বলে যে 'ডাকাত কালীর থানে' পুজোর অনুষ্ঠান করলে তারা বাধা দেবে। জগন্নাথ ঠাকুর এর প্রতিবাদ করে। দুই সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে দাঙ্গার মনোভাব তৈরি হয়। এই দাঙ্গার সুযোগ নেয় হাবিব মিঞা। হাবিব মিঞা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার এবং গ্রামের ফুড কমিটির সভাপতি। তার রয়েছে মস্ত বড় জোত। 'ক্ষেতির দিনে' সেখানে বারোটা লাঙ্গল চলে। তার আরেকটি পরিচয় সে কাপড়ের চোরাকারবারি। এতেও সে সন্তুষ্ট নয়। দাঙ্গার সুযোগে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ইন্ধন জুগিয়ে জগন্নাথ ঠাকুরকে হত্যার মাধ্যমে সে দখল করতে চায় বাঁধের ধারে অবস্থিত জগন্নাথ ঠাকুরের দেড় বিঘা ধানি জমি। তাই সে ধলা মস্তাইয়ের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দিয়ে তাকে প্ররোচিত করে জগন্নাথ ঠাকুরকে হত্যা করতে। ধলা মস্তাইও প্ররোচিত হয়। কিন্তু ধলা মস্তাই ও জগন্নাথ ঠাকুর দিনের বেলা পরস্পর-বিদ্বেষী হলেও রাতের বেলা তাদের উভয়কে পীড়িত করে একটি সমস্যা; তা হল বস্ত্র সংকট। কাপড়ের অভাবে তাদের দুজনের স্ত্রীই হুমকি দিয়েছে আত্মহত্যার। লক্ষণীয় তাদের কথোপকথন–

> ... যাচ্ছি দুখানা কাপড়ের জন্যে।
>
> – কাপড়?
>
> – হ্যাঁ, কাপড়। মান সম্মান আর রইল না মিঞা। বউ দু দিন ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। বলছে কাপড়ের যোগাড় না করলে গলায় দড়ি দেবে।
>
> মস্তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
>
> – কাপড় পাবে না ভাই, তার চেয়ে বউকে গলায় দড়ি দিতে বলো। আমাকেও তাই করতে হবে। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ৩২)

বস্ত্র সংকটে ভুগলেও সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় তারা দাঙ্গার জন্যে অপেক্ষা করে। এরই মধ্যে মারা যায় হাবিব মিঞার পেয়ারের স্ত্রী 'লালবিবি'। তাকে ধুইয়ে কাফনের কাপড় পরানো হয়। জীবিত মানুষ বস্ত্রহীন হলেও বস্ত্রাবৃত হয় মৃতদেহ। 'লালবিবি'র মরদেহের দাফন সম্পন্ন হয়। রাতে খবর আসে কারা যেন কবর খুঁড়ছে। কবরস্তানে গিয়ে দেখা যায় যারা কবর খুঁড়ছে তারা আর কেউ নয় – মুসলমানের বেটা ধলা মস্তাই আর হিন্দুর বেটা জগন্নাথ ঠাকুর। কবরে শায়িত মৃত নারীর বস্ত্র সংগ্রহ করে তারা রক্ষা করতে চায় জীবিত নারীর ইজ্জৎ। তবে লক্ষণীয় যে গল্পটিতে লেখক বস্ত্রসংকটের রূপায়ণ করলেও এ সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথনির্দেশ করেননি। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির খারাপ দিকটিকে দেখানো এবং তা থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' ও 'ইজ্জৎ' গল্পের আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বস্ত্র'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়'ও 'রাঘব মালাকার'; সুবোধ ঘোষের 'তমসাবৃতা' এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ' গল্পের কথা। পাঁচটি গল্পই বস্ত্রসংকট অবলম্বনে লেখা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি হাতিপুর গ্রামের আভরণহীন নারীদের দৈনন্দিন জীবনের লজ্জা ও দুঃখের করুণ আলেখ্য। লেখক এখানে বিশ্বযুদ্ধকালীন বস্ত্রসংকটের পটভূমিকায় খণ্ড খণ্ড চিত্রের নির্মমতার ও রূঢ় বাস্তবতার রূপায়ণের মাধ্যমে হাতিপুর গ্রামের নারীদের রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে শোচনীয় জীবনযাপনের অসহায়ত্বের কথা বলেছেন। গল্পটিতে প্রতিবাদ আছে কিন্তু প্রতিরোধের দৃঢ় শপথ নেই। সমালোচকের মতে, 'আসলে মানিক বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বিন্যাস করেছেন গল্পের কাহিনী ও পরিণতি; কোনো আইডিয়া বা সিদ্ধান্তকে আরোপ করতে চান নি' (আজিজুল, ১৯৯৮ : ৩২৫)। এ কারণে হাতিপুরের জনগণ বস্ত্রচোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তির পরিচয় প্রদানে সমর্থ হয়নি। তারা নিরুপায়, নির্জীব ও ম্রিয়মাণ হয়ে গৃহমুখী হয়েছে। হতাশা, দুশ্চিন্তা, আত্মহত্যা কিংবা কারাভোগের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে তাদের প্রতিবাদী সত্তার।

কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে বাস্তবতার বীভৎস বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করেননি। যাত্রা পালার সমান্তরালে তিনি পৌরাণিক কাল এবং বর্তমান সময় উভয়কেই তুলে ধরার পাশাপাশি গল্পের শেষে বাস্তবতার একটি ক্ষুদ্র নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন এবং প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পের সমগ্র পরিসর ধরে তিনি কলেজ পড়ুয়া যুবক গৌরদাসের ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সত্তার যন্ত্রণা ও শক্তিকে একত্রে মূর্ত করেছেন। এছাড়া তিনি দেখিয়েছেন প্রশাসনিক দুর্নীতির চিত্র, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নির্মম রূপ, আড়তদার-মজুতদার দেবীদাসের অতিপ্রচ্ছন্ন লোভ ও মুনাফা বৃদ্ধির অমানবিক স্বার্থসর্বস্ব প্রয়াস, ধূর্ত দারোগা কর্তৃক শখের যাত্রা-আসরের

আয়োজনের মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা এবং কাকার কাছে ভাইপো গৌরদাসের পরান্নজীবী জীবনধারণের কারণে স্পষ্ট কথা বলার অসহায়তার কথা।

অপরদিকে সুবোধ ঘোষ 'তমসাবৃতা' গল্পে মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের পটভূমিতে ধুলগড়া গ্রামের বাউরি চাষী আর বোষ্টম তাঁতি পরিবারের নর-নারীর দুর্দশা এবং সংকট উত্তরণের শান্ত মানসিকতাকে রূপায়িত করেছেন। মানুষের দুর্দশা ও আর্থিক অনটন কীভাবে মানুষের উন্নত রুচি ও শৌখিনতার মনোভাবকে অন্তর্হিত করে দেয় তারই বাস্তবসম্মত রূপায়ণ আছে গল্পটিতে। বাউরি জাতের মেয়ে জবার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন লেখক। গ্রামের সকল নারীই যখন নিরাভরণ, তখন জবা নিজের সম্ভ্রমের বিনিময়ে মোহনের নিকট থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করে নিজেকে বস্ত্রাবৃত করেনি, বরং অন্ধকারকে আক্রুরক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে গ্রামের সকল বিবস্ত্র নারীর সাথে মিলে নিজেও বিবস্ত্র হয়ে মাঠে 'রোপাই' এর কাজে গেছে এবং ভোর অবধি কাজ করে ঘরে ফিরেছে। লেখকের ভাষায়–

> ওরা আসছিল – বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা – মধ্যদিনের মত রুচি পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে, ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালোসুতোয় তৈরি এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ। (সুবোধ ঘোষের গল্প সমগ্র, পৃ. ১৭১)

লক্ষণীয় যে দুর্দশায় নিপতিত ধুলগড়া গ্রামবাসী কিন্তু বিদ্রোহ করেনি। তারা এই সংকটকে গ্রহণ করেছে স্বাভাবিকভাবে, শান্তমনে এবং তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সমালোচকের মতে, 'এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে এক অন্য জগতের আদর্শের আলোয় সুবোধ ঘোষ সম্পূর্ণ বিষয়টিকে দেখেছেন সমবেত প্রতিরোধের এক অভিনব উপায় হিসেবে' (অরিন্দম, ২০০১ : ৮৬)। সংকট উত্তরণে তাদের এই ব্যতিক্রমী পন্থা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ইহারা বিদ্রোহ করে নাই; বিদ্রোহ ইহাদের ধাতে নাই – বোধ হয় যেন, বসুমতীর অঞ্চলতলেই ইহারা শেষ আশ্রয়ের জন্য প্রতীক্ষমাণা। রিক্ততার এমন করুণ ও গ্লানিকর চিত্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।' (শ্রীকুমার, ১৯৯৬ : ৬৫০)

একই বিষয় অবলম্বনে রচিত তিন গল্পকারের গল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে কঠিন প্রতিবাদের ব্যর্থতাজনিত হতাশা, অসহায়ত্ব ও তিক্ততা; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে সেখানে আভাসিত হয়েছে সংকট নির্মূলে প্রতিবাদের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত; আর সুবোধ ঘোষের গল্পে দেখা গিয়েছে সংকট উত্তরণের শান্ত সংকল্প এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট আশার প্রতিচ্ছবি। গল্পের পরিণতি নির্দেশে তাঁদের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ – জীবন

সম্পর্কে তাঁদের বোধ ও আদর্শ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে ক্রমশ অগ্রসরমান, সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সক্রিয় সদস্য না হলেও সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল; আর সুবোধ ঘোষ ঠিক তার বিপরীতক্রমে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী – যার মূল প্রতীতি সনাতন ভারতীয়ত্বে আস্থা। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একই বিষয় অবলম্বনে গল্প রচনা করলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সংক্রান্ত মহাভারতের কাহিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পের কাহিনিতে যেভাবে অনুসৃত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের কাহিনিতে সেভাবে হয়নি, কেবল একটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে উক্ত কাহিনির আর কোনো উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না।

দুঃশাসন গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কালোজল' গল্পটিতে 'যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েছে' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৫৯) তেমনি রূপায়িত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পরবর্তী বাংলার জীবনচিত্র। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রভাবে বাংলার গ্রামগুলোতে দেখা দেয় ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়ক। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়কে। এই গল্পে প্রধান চরিত্র শীতল মাঝির দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেকটা 'ক্যামেরার ক্লোজ শটে' (উত্তম, ১৪২১ : ১৬২) রূপায়িত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পরবর্তী ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়কে পর্যুদস্ত গ্রাম বাংলার 'এক অণুবীক্ষণিক ছবি'। (উত্তম, ১৪২১ : ১৬২)

শীতল মাঝির নৌকার সোয়ারি তারাপদ দুর্ভিক্ষের পূর্বে ছিল শ্বশুরালয়ে আশ্রিত। সেখানে সে সারাদিন ঘরে বসে থেকে তাস-পাশা খেলেই সময় কাটাত। তার এই কর্মহীন অবস্থা দেখে শ্বশুর জানকী চক্রবর্তী তাকে চাকরির চেষ্টা করার তাগিদ দেয়। শ্বশুরের তাগিদে অসন্তুষ্ট হয়ে সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করে চলে যায় পশ্চিমে। শুধু পশ্চিমে নয় পশ্চিম ছাড়িয়েও আরো অনেক দূরে দিল্লী, লাহোর, লয়ালপুরে। সেখানে আত্মীয়-স্বজনহীন পরিবেশে অনাহারে অর্ধাহারে অনেক দিন কাটিয়ে অবশেষে ছোট মতো একটা চাকরি পায় পশমের কারখানায়। পাঁচ বছর পর তার বেতন বেড়ে দাঁড়ায় দেড়শো টাকায়। গত পাঁচ বছরে সে তার পরিবারের কোনো খোঁজ নেয়নি। আজ সে পরিবারের সান্নিধ্য লাভের জন্যে শীতল মাঝির নৌকায় চলেছে শ্বশুরালয় মধুগাঁয়ের গ্রামের পথে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে গ্রামের হয়ে গেছে অনেক পরিবর্তন। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে মারা গেছে গ্রামের অনেক মানুষ। যে মানুষগুলো মরেনি, বেঁচে আছে, তারা যেন মানুষ নয়, কতকগুলো আকারহীন, অবয়বহীন, ছায়ামূর্তি মাত্র। আবার অনেক মানুষই এই ফাঁকে দস্তুর মতো রাজা বনে গেছে। নৌকার মাঝি বাহান্ন বছর বয়সী শীতলের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকালীন তিন বছরের পরিবর্তন-চিত্র :

> তিন বছরে কি আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম। ... শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রাম গুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। ... মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতকগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি মাত্র। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৩৫)

গল্পের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রস্থল আড়িয়াল খাঁ নদী। এই নদীর কালোজল শুধু জীবন বাঁচায় না, কালনাগিনীর মতো দংশনও করে। আড়িয়াল খাঁ নদীর বেশ কয়েকটি বাঁক পেরিয়ে শীতল মাঝির নৌকার সোয়ারি তারাপদ অবশেষে পৌছায় তার শ্বশুরালয় মধুগাঁয়ে। সেখানে পৌছে বড় শালা অনন্তের স্ত্রী প্রতিমার মুখে সে শুনতে পায় দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে তার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কাহিনি :

> কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। আর করুণা! পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৩৭)

এই দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যেও রয়েছে চোরাকারবারি মথুরা দাস। দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়কের মধ্যে যেখানে বাজারে চাল, ডাল, তেল, নুন কিছুই মিলছে না সেখানে মথুরা দাস চোরাকারবারে লিপ্ত। রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে সে দশ বস্তা চাল-ডাল পাচার করছে বল্লভপুর বাজারে অবস্থিত নিজস্ব গোলায়। নৌকার ভাড়াবাবদ শীতল মাঝিকে মথুরা দাস কুড়ি টাকা দিলেও শীতল জানে, সে আর কত পেয়েছে, মথুরা দাস তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে। শীতলের ভাষায় : 'তার চাইতে ঢের বেশি পেয়েছে মথুরা দাস। শুধু একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশ ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ির পাহাড়।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৩৯)

দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সময়ে কলেরার মড়কের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'পুষ্করা' (১৩৫১) গল্পটি। গল্পটিতে 'একদিকে মানুষের অন্ধ সংস্কার উপস্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে যুদ্ধের সময়ে মানুষের খাদ্যহীনতার চরম রূপ ধরা পড়েছে' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৬১)। 'একই সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে 'মানুষের সংস্কার, ক্ষুধার তাড়না ও মৃত্যুর হাতছানি' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৬১)। 'বিত্তভোগী মানুষের অন্ধ দেবভক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতি লেখকের বিদ্রূপ বাণীও এখানে সরোষে উচ্চারিত হয়েছে।' (জগদীশ, ১৪২০ : ৮)

গল্পের শুরুতেই দেখা যায় তর্করত্ন কালীপূজায় বসেছেন। শুক্লাচতুর্দশীর রাতে কালীপূজা কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় মনে হলেও এ সাধারণ কালীপূজা নয়। আশেপাশের দশখানা গ্রাম জুড়ে কলেরার মড়ক দেখা দিয়েছে। ছয় মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো পর্যন্ত কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মারা যাচ্ছে। বাতাসে ভাসছে কান্নার প্রতিধ্বনি, পচা মড়ার গন্ধ। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে মুখাগ্নি করা মড়া। নদীতে ভাসছে ফুলে ওঠা মরদেহ। ঝোপঝাড়ে উঠছে শেয়ালের ডাক আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশান-কুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ। লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে এই বিভীষিকাময় চিত্র: 'মৃত্যু যেন চারিদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে – একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার আর বাকি আছে কোথায়' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৪৪)। এই মৃত্যু, এই মারী, এই মন্বন্তর দেবীর কোপ। তাই শ্মশানে আয়োজন করা হয়েছে শ্মশান কালীর পূজার। পূজার উদ্দেশ্য দেবীর কোপকে শান্ত করা।

দেবীর কোপকে শান্ত করার জন্যে একখানা বড় কলাপাতায় পোয়াটাক বোকা পাঠার মাংস আর স্তূপাকারে সাজানো খান কয়েক শুকনো চিমসে লুচি দিয়ে তৈরি শিবা ভোগ নিয়ে শ্মশানে বীরাসনে বসেছেন সিদ্ধপুরুষ, পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে মা কালীর দৈনন্দিন পূজা সম্পন্নকারী রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্ন; মা কালীর সাক্ষাৎ শিষ্য। তাকে তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে পূজা করতে নিয়ে এসেছে গ্রামেরই সমৃদ্ধ মহাজন তালুকদার বলাই ঘোষ। দেবীর জন্যে প্রসাদ নিয়ে শ্মশানে প্রতীক্ষা করছেন তর্করত্ন। রাত তিনটা অতিক্রান্ত কিন্তু দেবী আসেন না। সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন, তর্করত্নও উদ্বিগ্ন। এমন সময় অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি বেশে যিনি আসেন তিনি দেবী নন; ডোমপাড়ার পাগলি। তাকেই তর্করত্ন মনে করেন দেবী। শিবা ভোগ সম্পন্ন হয়। পুষ্করা কেটে যায়। মারী ও মড়কের বিষ নীলকণ্ঠের মতো পান করে ডোমপাড়ার পাগলিটা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করে। পূজা সফল হওয়ায় তর্করত্ন তিনশো টাকার পরিবর্তে দক্ষিণা পান পাঁচশো টাকা। কারণ যুদ্ধের বাজারে বলাই ঘোষ কামিয়েছে বেশ :

> এদিক দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। যুদ্ধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত! (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৪৬-৪৭)

–উদ্ধৃতিটি হতে এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধের কারণে যেমন কলাই ঘোষের ভাগ্য বদলেছে তেমনি বদলেছে তর্করত্নের অদৃষ্ট। শ্মশানের বুকে শ্মশানকালীর পুজোর বর্ণনায় বীভৎস বিভীষিকার উদ্রেক করে গল্পটি সার্থক।

'ভাঙা চশমা' (১৩৫১) গল্পটি একদিকে 'মুল্যবোধের বিপর্যয়ের কাহিনী' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৬১), আরেক দিকে 'ব্যক্তিজীবনেরই মানসবিশ্লেষণ' (জগদীশ, ১৪২০ : ১২)। দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে একজন ব্রতী আর একজন ব্রতভ্রষ্ট শিক্ষকের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে ভাঙা চশমা গল্পে। দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে একজন শিক্ষক ব্রতনিষ্ঠ থাকেন আর একজন শিক্ষক ব্রতভ্রষ্ট হয়ে পড়েন তারই আলেখ্য গল্পটি। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত: 'ভাঙা চশমা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে মানুষের তৈরি সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের কারণে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতির দিকের সফল প্রতিচিত্রণ মেলে'। (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ৩২৩)

গল্পটি বিবৃত হয়েছে ব্রতভ্রষ্ট শিক্ষকের জবানিতে। তিনি একজন ফার্স্টক্লাস এম. এ; মফস্বল শহরে ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার। দুটি টিউশনির বেতনসহ তার মাসিক আয় একশো টাকা। 'ইনফ্লেশন', 'কন্ট্রোল' আর কালোবাজারে এই টাকাতেও তার স্ত্রীর মুখে অন্ধকার। তার ওপর রয়েছে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। এরইমধ্যে তিনি 'রিলিফ ওয়ার্ক' করার জন্য সাব ডেপুটি গ্রেডের অফিসারের অস্থায়ী চাকরি পান এবং চলে আসেন গ্রামে। দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রাম তার প্যান্টের ক্রীজ আর হ্যাটের ঔদ্ধত্য দেখে চমকে ওঠে। দলে দলে সাহায্যপ্রার্থী এসে তার কাছে ভিড় করে। তিনি যেভাবে এই সাহায্যপ্রার্থী মানুষগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার জনগণের অবস্থা: 'অমানুষিক মানুষের একটা বীভৎস সমাবেশ। ছেঁড়া কাপড়ের ভেতরে হাড় বের করা অতীতের মানুষগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাঁধ পর্যন্ত জটা বাঁধা চুল, মুখে এলোমেলো দাড়ি, চোখের দৃষ্টিতে ঘষা কাঁচের মতো অর্থহীন শূন্যতা।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৫০)

–এই বর্ণনায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার জনগণের করুণ অবস্থার চিত্র যেমন স্পষ্ট তেমনি স্পষ্ট এই মানুষগুলো সম্পর্কে কথকের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত 'অমানুষিক মানুষ'গুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে পেরে তার মনে প্রভুত্বের আস্বাদ জেগে ওঠে। তার মনে হয় এত দিনে তিনি সত্যিকারের সম্মান আদায় করতে পেরেছেন; তিনি জিতেছেন। দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামগুলোকে দেখে তার কাছে মনে হয় শ্মশান। তার ভাষায়:

> দূরে শেয়ালের ডাক শুনি – শকুনের আর্তনাদ অবরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু মানুষের গলা শুনতে পাই না – শিশুর কান্না ভেসে আসে না। ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষে হতশেষ মানুষ ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে। আর না খেয়ে মায়ের বুকে ছটফট করে শুকিয়ে মরে গেছে শিশুরা। (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৫০)

দুর্ভিক্ষে গ্রামগুলি শ্মশানে এবং মানুষগুলি 'অমানুষিক মানুষে' পরিণত হলেও তিনি খুশি। কারণ দুর্ভিক্ষ বদলে দিয়েছে তার জীবনকে। তাকে দিয়েছে প্রভুত্বের আস্বাদ। তাই তিনি মনে মনে বলেন : 'দুর্ভিক্ষের জয় হোক – রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরিটা আমি পেয়ে গেলাম।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৫০)

তার এই উক্তিতেই স্পষ্ট যে তিনি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর। লোভ, স্বার্থপরতা, গৌরববোধ আর হাকিমির মোহ-ই তাকে ব্রতচ্যুত করেছে। তবে গল্পটির শুরু থেকেই তার তীব্র, তীক্ষ্ণ আত্মধিক্কার আছে। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অস্থায়ী সাব-ডেপুটি গ্রেডের অফিসারের চাকরি হয়তো একদিন তাকে হাকিমের মর্যাদায় আসীন করবে, এমন সংশয় মেশানো বিশ্বাসেই শিক্ষকতার মহান ও স্থায়ী পেশা তিনি ত্যাগ করেছেন। এটা তার জন্যে একটা ট্র্যাজেডি। তার এই ট্র্যাজেডি সময়ের, যুগের এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের অবক্ষয়ের অভিশাপে নির্দিষ্ট। তার ট্র্যাজেডি এই গল্পের সত্য, চরিত্রের সত্য এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পে সত্য।

অপর দিকে আছেন একজন ব্রতী শিক্ষক, যিনি সারা জীবন ধরে আধা-পেট খেয়ে, তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন একটি মাইনর স্কুল, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যোগাড় করেছিলেন ছাত্র, বৌয়ের গলার হার বিক্রি করে উঠিয়েছিলেন স্কুল ঘরের চালা। আশা করেছিলেন ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন; হেডমাস্টার হবেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তার সারা জীবনের পরিশ্রম আর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। রিলিফ অফিসারের কাছে ব্যক্ত আর্তনাদে তার স্বপ্নভঙ্গের খেদ স্পষ্ট: 'কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্ররা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারা জীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন!' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৫৪)

দুর্ভিক্ষ কীভাবে ব্রতী শিক্ষকের স্বপ্নকে বিনষ্ট করে দিয়েছে তা উদ্ধৃতিটিতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তিনি হয়ে গেছেন পাগল; ভাঙা চশমা পরিহিত ভূতপূর্ব ভদ্রলোক। গল্পটি 'এ যুগের অর্থলোভ ও আদর্শবাদের অনুপযোগিতা আমাদের মনে সঞ্চারিত করে দেয়।' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৬১)

'খড়্গ' গল্পটিও বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। বিশ্বযুদ্ধকালে দরিদ্র হওয়ার অপরাধে জীবন কীভাবে দুহাতের মুঠো থেকে খসে পড়ে তারই শোচনীয় কাহিনি এই গল্পটি। এই গল্পের সকল চরিত্রই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে প্রভাবিত। গল্পের প্রধান চরিত্রদ্বয় খেতু ও ভোমরা ভুঁইমালির সন্তান। খেতুর জমি নেই, আধিও নেই, সে সোয়ারি বয়ে আর ভোমরা ঝিনুক সংগ্রহ করে চুন প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে তাদের জীবন যেমন বিপন্ন হতে চলেছে তেমনি বিপন্ন হতে চলেছে তাদের বলদ দুটির জীবন। শীর্ণ বলদ দুটি দেখে

খেতুর খেদোক্তি: 'খইল, ভূষি, কলাই ডালের খিচুড়ি – সে সব এখন গতজন্মের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষই না খেয়ে মরে যাচ্ছে তো গরু।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২২৬)

খেতুর মতোই দুর্ভিক্ষে জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে খেতুর বন্ধু নীলাইয়ের। নীলাই জাতিতে মুচি। মৃত গরুর চামড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে সে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে তার জীবিকা নির্বাহের পথ হয়ে গেছে রুদ্ধ। বন্ধু খেতুর কাছে সে ব্যক্ত করেছে তার বিপন্ন অবস্থার কথা: 'ঘরে একরত্তি চামড়া নেই, কাল থেকে হাড়ি চড়েনি। বউকে পাড়ায় পাঠিয়েছি চালের চেষ্টায়। আর বসে বসে ভাবছি মানুষ না হয়ে যদি গরু হতাম তা হলে মাঠের ঘাস পাতা খেয়ে বেঁচে থাকা চলত।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৬৬)

—উদ্ধৃতিটিতে নীলাই ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকার কথা বললেও তা সম্ভব ছিল না। কারণ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কারণে মাঠের ঘাসও মরে গেছে। ঘাসের অভাবে খেতু তার বলদ দুটোকে খেতে দিয়েছে শুকনো খড়। দীর্ঘদিন সবুজ ঘাস খেতে না পাওয়ায় খেতুর বলদ দুটো অস্থিচর্মসার; বেশি দিন হয়তো বাঁচবে না।

খেতু ও নীলাই উভয়েই যুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে বিপর্যস্ত। খেতুর কাছে তাই নীলাইয়ের জিজ্ঞাসা : 'আচ্ছা, যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারিস?' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৭১) কিন্তু খেতুও জানে না যুদ্ধ আদৌ থামবে নাকি থামবে না। নীলাইয়ের প্রতি তার হতাশাপূর্ণ উত্তর : '–যুদ্ধ কবে থামবে? ভগবানই জানেন' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৭১)। অর্থাৎ ভগবানই জানেন যুদ্ধ কবে থামবে; খেতু কিংবা নীলাই নয়।

খেতু কিংবা নীলাইয়ের জীবনে যুদ্ধ অভিশাপ হিসেবে আসলেও হরিলালের জীবনে যুদ্ধ এসেছে আশীর্বাদ হয়ে। হরিলাল গ্রামের শুধু মোড়ল নয়, মোড়লেশ্বর। তাকে মহারাজা চক্রবর্তী বললেও ভুল হয় না। রামসই ঋণসালিসী বোর্ডের সে প্রতিপত্তিশালী সদস্য। চেয়ারম্যান তার খাতক। তার সম্পর্কে লেখকের উক্তি: 'হরিলাল গ্রামের তালুকদার। জমি আছে, পয়সা আছে। কারবার তো আছেই। যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৬৪)

—উদ্ধৃতিটিতে 'যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন' — কথাটির মধ্য দিয়ে লেখক ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ হরিলালের জীবনে কতোটা আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে!

গল্পটিতে সীমাহীন লোভ, লালসা ও ক্ষুধার দুটি আখ্যান সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। একটি আখ্যানে রয়েছে মহাজন হরিলালের নারীমাংস লোলুপতার আদিম কামনার ইতিবৃত্ত, অপরটিতে রয়েছে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বন্ধু খেতুর জীবনের

প্রধান অবলম্বন বলদ দুটির হত্যাকারী নীলাই মুচির বৃত্তান্ত। নীলাই খেতুর বলদ দুটিকে হত্যা করেছে প্রাণের দায়ে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে, পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। কিন্তু হরিলাল ভোমরার ওপর উদ্যত হয়েছে তার আদিম কামনার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে।

গল্পটি খেতু ও ভোমরা দম্পতির ট্র্যাজেডি। তাদের ট্র্যাজেডি করুণ ও মর্মান্তিক। বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণামে এবং হরিলালের চক্রান্তে ভোমরা তার দেহশুচিতা হারায় আর খেতুও জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন বলদ দুটি হারিয়ে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। ঘরে ও বাইরে দুদিকেই হারানো খেতুর নিষ্ফল মূর্তি আমাদের মনে বিশ্বযুদ্ধের শোচনীয় প্রভাবকেই মূর্ত করে তোলে। মূলত 'অবক্ষয়-নারী নির্যাতন-ক্ষুধা-কালোবাজারি-বেকারত্ব এসবের মধ্য দিয়ে যুদ্ধকাল ঘটিয়েছে পরিবার-সমাজের ভাঙন।' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৯)

'ডিম' (১৩৫১) গল্পটিও যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। মিলিটারির জন্যে ডিমের যোগান দিতে গিয়ে একটি পরিবার কীভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারই কথকতা এই গল্পটি।

গল্পের প্যারীলাল মিলিটারি কলোনির দালাল। তাকে মেজর সাহেব দায়িত্ব দিয়েছেন বড়দিনের কেক তৈরি ও নববর্ষের প্রীতিভোজের জন্যে ডিমের যোগান দিতে। রোজ পাঁচশো করে ডিমের যোগান দিতে হবে। প্যারীলালের ভাষায় : 'ওদেরই দাবি। সামগ্রিক যুদ্ধের দাবি। রোজ পাঁচশো করে ডিম যোগাতে হবে' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৮০)। কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনপদে যেখানে মানুষ ও পশু-পাখি কারোরই অন্নের সংস্থান নেই সেখানে ডিম আসবে কোথা থেকে। প্যারীলাল তাই রেগে যায়। সে ভাবে মানুষ বা ঘোড়া কেন ডিম পাড়ে না। কিংবা কী হয় একরাশ চিল শকুনের ডিম সাপ্লাই দিলে। রাতে ঘুমিয়ে গেলে সে স্বপ্ন দেখে আকাশে তারা নেই, শুধু রাশি রাশি জ্যোতির্ময় ডিম সেখানে আলোক বিস্তার করছে। মাটি দিয়ে মানুষ হাঁটছে না, হাঁটছে হাত পা ওয়ালা ডিম। ডিম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্যারীলাল পরদিন গ্রামের দিকে আসে। এসময় লেখক গ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে মন্বন্তরে বিপর্যস্ত বাংলার চিত্র উদ্ভাসিত : 'একফালি টানা পথ ধরে মাইল টাক এগিয়ে গেলে গ্রাম। অথবা আগে গ্রাম ছিল। মন্বন্তরের ঝাপটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। ধ্বসে পড়া চালা, পোড়ো ভিটে। মরা মানুষের দীর্ঘশ্বাসেই যেন রাশি রাশি বাঁশের পাতা উড়ে পথটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৮২)

গ্রামে পৌঁছে প্যারীলাল ডিম সংগ্রহের দায়িত্ব দেয় রজনীকে। প্যারীলালের নির্দেশে রজনী প্রচণ্ড শীতে তিনখানা গ্রাম ঘুরে সংগ্রহ করে দুকুড়ি ডিম। ডিম সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আসলে রজনীর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত নাতিছেলে ডিম খেতে চায়। কিন্তু রজনী এতে রাজি নয়। ছেলেটি আবার ডিম খেতে চাইলে রজনী রেগে যায় এবং ছেলেটিকে

হত্যা করতে উদ্যত হয়। হত্যা করতে চাওয়ার কারণ রজনী নিজেও ডিম খাওয়ার লোভ অনুভব করে। সে আসলে ছেলেটিকে হত্যা করতে চায় না, হত্যা করতে চায় তার অসংযত লোভকে। ছেলেটিকে হত্যা করতে দেখে সারদা (রজনীর পুত্রবধূ) রজনীর মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে। শাবলের আঘাতে রজনী ছিটকে পড়ে আগুনে। মৃত্যু হয় তার। মিলিটারির ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে ধ্বংস হয় একটি পরিবার। 'প্রাত্যহিক শহুরে জীবনে ডিম সামান্য জিনিস হলেও ক্ষুধিত জীবনে তার প্রার্থনা কি অভিশাপ আনতে পারে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্যভাবে সেই কাহিনী পরিবেশন করেছেন। সামরিক বাহিনীর ক্রিসমাস কেকের বিলাসিতা আর দরিদ্রের মৃত্যুযন্ত্রণা সুকৌশলে একই সূত্রে অন্বিত হয়ে গেছে এই গল্পে।' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ৬৪)

পাঁচ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশকিছু গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারির প্রসঙ্গ এসেছে অনেকটা পরোক্ষভাবে; আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও জীবনযাত্রায় যুদ্ধের প্রভাবকে নির্দেশ করতে। এ জাতীয় গল্পগুলো হল: 'নীলা', 'তৃণ', 'নিশাচর' *(বীতংস)*; 'ভাঙা বন্দর' *(ভাঙা বন্দর)*; 'মমি' *(দুঃশাসন)*; 'একটি শত্রুর কাহিনী', *'ডিনার'*, 'ভোগবতী'*(ভোগবতী)*; 'রেকর্ড'*(শুভক্ষণ)*; ও 'আতিথ্য'*(একজিবিশান)*। নিম্নে উল্লিখিত গল্পগুলোতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তা আলোচনা করা হল।

'নীলা' (১৩৫০) গল্পে বিশ্বযুদ্ধের কথা এসেছে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বাজারে চিনি শিল্পের ওপর যুদ্ধের প্রভাবকে নির্দেশ করার জন্যে। 'তৃণ' গল্পে যুদ্ধের কথা এসেছে বিশেষত বিশ্বযুদ্ধের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে 'ধাওয়া'দের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা দেখানোর জন্যে। পুলিশের তাড়া খেয়ে নিষিদ্ধ ইশতেহার সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানের সময় বামপন্থী রাজনীতির এক কর্মীর দৃষ্টিতে বিশ্বযুদ্ধকালীন নগর কলকাতার চিত্র রূপায়িত হয়েছে 'নিশাচর' গল্পে। 'ভাঙা বন্দর' (১৩৪৮) গল্পটি নতুন আর পুরাতনের দ্বন্দ্বে পুরাতনের পরাজয়ের গল্প। আর এই পরাজয়ের পশ্চাতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষের বাজারে আকস্মিকভাবেই বৃদ্ধি পায় লোহার চাহিদা। ফলে পুরোনো লোহালক্কড় ও যন্ত্রাংশের দামও বৃদ্ধি পায়। ভাঙাবন্দর গল্পে আমরা দেখি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে যুদ্ধের বাজারে তেলকল চালানো ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে কোম্পানি তেলকলের লোহালক্কড় সব বিক্রি করে দিতে চেয়েছে। চা-স্টলের মালিক হারানের ভাষায়: 'যুদ্ধের যে রকম বাজার, সাহস পাচ্ছে না কোম্পানী। শুনেছি লোহা লক্কড়গুলো সব বিক্রি করে দেবে।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ১৬৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানি 'জার্মান-ফ্রান্স' সীমান্তে 'সিগফ্রিড লাইন' নামে একটি সুরক্ষিত সীমারেখা স্থাপন করে এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ফ্রান্স 'ফ্রান্স- জার্মান' সীমান্তে 'ম্যাজিনো লাইন' নামে একটি সুরক্ষিত সীমারেখা স্থাপন করে। এই দুটি সীমারেখায় স্থাপিত মারণাস্ত্র পরস্পরের দিকে বিদ্বেষ-বিষাক্ত দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে। 'মমি' গল্পে এই দুটি সীমারেখার প্রসঙ্গ এসেছে মূলত মণীন্দ্রের কল্পনায় বিদ্বেষ-সংশয়-শঙ্কামুক্ত নতুন পৃথিবীর স্বপ্নকে নির্দেশ করতে। 'একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পে 'ভারতের শত্রুমিত্র নিরূপণের চিরন্তন প্রশ্ন একাগ্র হয়ে উঠেছে যুদ্ধের দুর্দিনে' (জগদীশ, ১৪২০ : ১৪)। কাঠুরে দম্পতির প্রাণ কেড়ে নিতে যুদ্ধের প্রয়োজনে এরোড্রাম নির্মাণ যজ্ঞ কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে তারই কথকতা বর্ণিত হয়েছে 'ভোগবতী' (১৩৫৩) গল্পে। কপর্দকহীন এক ব্যক্তির উত্থান-পতন এবং তার নীতিহীনতার কথা বলার জন্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে 'ডিনার' (১৩৫৩) গল্পে। অধ্যাপক দম্পতির মনকে আলোড়িত করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইউরোপের একটি দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গানের রেকর্ড কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে তার বর্ণনা রয়েছে 'রেকর্ড' (১৩৬৬) গল্পে। 'ইতিহাস' (১৩৫৩) গল্পে আগস্ট আন্দোলনকালীন সময়কে নির্দেশ করতে এসেছে বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ। বিশ্বযুদ্ধ ফেরত এক ভারতীয় সৈনিকের জবানিতে যুদ্ধের সময়ের অমানবিক কর্মকাণ্ডের কথা উঠে এসেছে 'আতিথ্য' গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে শুধু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত বাংলার জীবনচিত্র রূপায়ণ করেই থেমে থাকেননি। তিনি প্রত্যাশা করেছেন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের অবসানের; ধনে-জনে-সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ সোনার বাংলার। 'ডিম' গল্পে প্যারীলালের কথায় প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর-পরবর্তী সোনার বাংলার স্বপ্ন: 'যুদ্ধ থেমে যাবে, আবার ফসল উঠবে, সুখে শান্তিতে ভরে যাবে দেশ। ... তখন আবার এই বাংলা হবে সোনার বাংলা।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ২৮২)

অর্থাৎ 'সোনার বাংলার মোহ ও সংস্কারে বাস্তবত উৎকট দারিদ্র্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সর্বদাই ছিল বিশ্বাসের শক্ত মাটি' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৮)। 'বীতংস' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'তৃণ' গল্পেও আমরা অনুরূপ স্বপ্নের উল্লেখ পাই। জমিদারের অত্যাচারে এবং পাইকারের প্ররোচনায় বশির যখন রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন ধাওয়া-পাড়া ঘুমে আচ্ছন্ন। ধাওয়া-পাড়ার জেলেদের ঘুম দেখে বশিরের তখন মনে হয়: 'হয়তো ঘুমের ঘোরে ওরা স্বপ্ন দেখছে যুদ্ধ থেমে গেছে; ক্ষেতে দুলছে সোনার শীষ, মাছের ভারে জাল ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম করছে; রোসেনার গায়ে উঠেছে রূপোর গয়না, পরনে রঙীন ডুরে শাড়ী।' (নারায়ণ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬ : ৩২২) অর্থাৎ যুদ্ধ পরবর্তী সোনালি সুদিনের স্বপ্ন তাদের মনোজগতে ক্রিয়াশীল।

ছয়

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, ম্যালেরিয়া-কলেরার মড়ক প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলোতে রয়েছে নেতিবাচক চরিত্রের ছড়াছড়ি। 'হাড়' গল্পের রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জি , 'নীলা' গল্পের ভাস্কর নটরাজন, 'তৃণ' গল্পের পাইকার, 'কবর' গল্পের শা-নওয়াজ, 'লুচির উপাখ্যান' গল্পের সিদ্ধেশ্বরবাবু, 'নক্রচরিত' গল্পের নিশিকান্ত, 'দুঃশাসন' গল্পের দেবীদাস, 'কালোজল' গল্পের মথুরা দাস, 'পুষ্করা' গল্পের তর্করত্ন কিংবা বলাই ঘোষ, 'ভাঙা চশমা' গল্পের কথক জনৈক শিক্ষক, 'খড়্গ' গল্পের হরিলাল এবং 'ডিম' গল্পের প্যারীলাল এদের কেউই ইতিবাচক চরিত্র নয়। নেতিবাচকতা এদের মজ্জাগত। এতসব নেতিবাচক চরিত্রের বূপায়ণের মধ্যদিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মূলত ইতিবাচক চরিত্র তথা শুদ্ধসত্তার সন্ধান করেছেন। আবার গভীরভাবে এই চরিত্রগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এরা সবাই অপহারী। নিশিকান্ত ও মথুরা দাস হরণ করেছে মানুষের মুখের অন্ন, দেবীদাস হরণ করেছে শরীরের বস্ত্র আর হরিলাল হরণ করেছে নারীর সম্ভ্রম। আবার ভাস্কর নটরাজন, নিশিকান্ত, দেবীদাস ও রায়বাহাদুর সাহেব–এরা সবাই লোভী। 'নিশি কর্মকার কিংবা দেবীদাস একটু মোটা আঁচড়ের মুনাফালোভী আর এইচ. এল.চ্যাটার্জি একটু সূক্ষ্ম প্রকৃতির।' (উত্তম, ১৪২১ : ১৬৬)

সাত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে সর্বদাই ব্যক্ত হয়েছে বাঁচার কথা তথা মানবীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনকে ভালোবেসে বেঁচে থাকাটাই সত্য। জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি-হতাশা-গ্লানি কখনোই শেষ কথা হতে পারে না। কঠিন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, জীবনের বেঁচে থাকাটাই যে প্রধান সত্য, একথা তাঁর গল্পে তিনি বারবার বলেছেন। সুস্থ মানবিকতাবোধ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর গল্পে। গল্পের বিস্তৃত পরিসরে তিনি যে বাঁচার কথা বলেছেন তা সকল মানুষের জন্যে সকল মানুষকে নিয়ে বাঁচা। সমালোচকের মতে,

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে তাঁর সময়কে পাশে নিয়ে মানুষ আর জীবনের বাঁচার কথা স্পষ্ট করে বলারই প্রয়াস একমাত্র সত্য। এই বাঁচা মূলত যৌনতার বিকৃতি থেকে বাঁচা, পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচা, মানুষের জন্য মানুষের বাঁচা, জীবনকে বলিষ্ঠ এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঁচা, নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম সম্পর্কের সুস্থতার জন্য বাঁচা।' (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ২৮৪)

ফলে 'তাঁর কাছে মানুষ হয়েছে হৃদয়ের শব্দ, আকণ্ঠ থেকেছে জীবনপিপাসা' (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ২৮৪)। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তিনি 'ব্যক্তি মানুষের

সম্ভাবনাকে কখনোই নাকচ করে দেননি' (উত্তম, ১৪২১ : ২০৭)। তাঁর গল্পে রয়েছে নিজস্বতার সুর যা আমাদের কাছে অন্য রকম এক আস্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। 'সাম্যবাদী ভাবনা তাঁকে তাঁর একাধিক গল্পে প্রগতিবাদী, প্রতিবাদী, গভীরমনস্ক, আগামীদিনের সুস্থ মানবসমাজ ও মানবিক বোধের গল্পকারের মর্যাদা দেয়' (বীরেন্দ্র, ২০০৯ : ২৮৪)। তাঁর গল্পের জগৎ প্রকৃত অর্থেই নতুন সুরের জগৎ, যা সত্য, সুন্দর, শুভ্র, মানবিক বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একক কোনো ব্যক্তির জীবনের অসহায়ত্ব ও বেদনাকে রূপায়িত করেননি। এরূপ প্রবণতা তৎকালের অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও দেখা যায়। তাই সমালোচক মন্তব্য করেছেন: 'বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ, মন্বন্তর ও দাঙ্গার উন্মত্ত কালসীমায় একজন ব্যক্তির অসহায়ত্ব, বেদনাময় আত্মরক্ষার করুণ লড়াইকে শিল্পী মহত্ব ও সার্বজনীনতার মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণ করেন নি' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৭)। সমালোচকের এরূপ মন্তব্যের সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে দুটি। প্রথমত, যুদ্ধ, মন্বন্তর ও দাঙ্গার প্রভাব কখনো একক কোনো ব্যক্তির ওপর দিয়ে যায় না, যায় সমষ্টির ওপর দিয়ে। তাই একজন ব্যক্তির অসহায়ত্ব ও বেদনাময় আত্মরক্ষার করুণ লড়াইকে মহত্ব ও সর্বজনীনতার মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণ করার চাইতে শিল্পীরা সমষ্টির জীবনের অসহায়ত্ব ও বেদনাময় আত্মরক্ষার করুণ লড়াইকে মহত্ব ও সর্বজনীনতার মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সেই সময়ের বেশিরভাগ লেখকই ছিলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত, তাই তাঁরা ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির জীবনের রূপায়ণেই ছিলেন অধিকতর যত্নবান।

আট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, মূল্যবোধের বিনষ্টি, বস্ত্রসংকট এবং ম্যালেরিয়া-কলেরা, মহামারী প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)[২], প্রবোধ সান্যাল (১৯০৭-১৯৭০)[৩], মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)[৪], বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়[৫], তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়[৬], মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)[৭], সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০)[৮], নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭-২০০৭)[৯], নরেন্দ্রনাথ মিত্র[১০], সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)[১১] প্রমুখ। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর বাঙালি জীবনের ভাঙন ও তার প্রতিক্রিয়া এদের কয়েকজনকে 'নবজন্ম দিয়েছিল' (শিপ্রা দে, ১৯৯৬ : ২২)। কারণ ইউরোপীয়

জাতিগত যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও মুনাফালোভী শস্যব্যবসায়ীর অর্থনীতির জট উন্মোচিত না হলেও এরা বুঝেছিল যে, 'এই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ সবই মনুষ্য সৃষ্ট, তা প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, দৈব নির্দেশ বা আপতিক নয়, বরং পূর্বপরিকল্পিত ক্রমঘনায়মান পুঞ্জীভূত লোভের সংকট' (আকতার কামাল, ২০০০ : ২৯)। এদের সকলের রচনায় উপরিউক্ত বিষয়গুলোর রূপায়ণ ঘটলেও পার্থক্য রয়েছে রূপায়ণ কৌশলের, দৃষ্টিভঙ্গির এবং প্রবণতার। এদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন সংকটকে ধরতে চেয়েছেন প্রধানত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক সংকটকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন সমাজবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিতে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজ এসেছে পরোক্ষভাবে কিছুটা পটভূমিরূপে।

এদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন 'সে জাতেরই শিল্পী যিনি স্বপ্নজলে খুব একটা স্নান করেননি বরং ঘৃণিত, রূঢ় বাস্তবতা অন্বেষায় ফুটিয়ে তুলেছেন স্ব-সমাজের জীবন্ত রূপ' (আতাউর, ২০১০ : ২০)। সমকাল ও সমসাময়িক সমাজকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন তিনি। জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে কবির দায়িত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। ...কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান (জীবনানন্দ, ১৩৬২ : ১২)'। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে যদি বলা হয় 'ছোটগল্পকারের পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। ...ছোটগল্পের অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'– তাহলে এই ইতিহাস ও 'তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতার' (অরুণকুমার, ২০০৪ : ৩৭৬) যথার্থ শিল্পী বলা যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি তাঁর সমকালে সংঘটিত বিষয় অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন এবং অন্ধকারকে অতিক্রম করে মুক্তির তথা আলোর সন্ধান করেছেন। এই আলোর সন্ধানের চেষ্টা মূলত তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। আলোর সন্ধান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবেন্দু ঘোষ উভয়েই করেছেন, তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর যেখানে বক্র, একটু তিক্ততায় ক্লান্ত, কখনো বা তাত্ত্বিক আলোচনায় নিবদ্ধ সেখানে নবেন্দু ঘোষের গল্প অনেকটা শ্লোগানধর্মী। পক্ষান্তরে আঙ্গিকনিষ্ঠ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিছুটা কাব্যিক ভাষায়, ব্যঞ্জনার আভাসে অন্ধকারের চিত্র এঁকেও, অনেকটা আশাবাদী। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য ছিল গল্পে সংগ্রামী চেতনার প্রকাশে। তাঁর লেখায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও তাদের সংগ্রামের কথা আছে কিন্তু কোনো ইজমই সেখানে শেষ কথা নয়, চিরন্তন মানবজীবনই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। নিরাবৃত সততা তাঁর গল্পে এনেছে

ভিন্ন এক মাত্রা। তিক্ততা, বিদ্রূপ তাঁর গল্পে থাকলেও নাস্তিক্য চেতনার মাঝে আত্মবিলুপ্তি নয় বরং মানবতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি।

নয়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনবাদী ও যুগোত্তীর্ণ কথাসাহিত্যিক। তাঁর ছোটগল্পে একদিকে মহৎ শিল্পের মিশ্রলক্ষণ পরিদৃশ্যমান, অপরদিকে কলুষিত ও বিপন্ন সমকালকে ধারণ করেও পরিশুদ্ধ ও স্থিতিশীল আগামীর উজ্জীবন তথা নবযুগ সৃষ্টির পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। দেশব্যাপী অত্যাচার, অরাজকতা, অস্থিতিশীলতা ও জনজীবনে বিপন্নতার – মধ্যেও বৈরাগ্য নয়, জীবন ও মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা নয়, হতাশাগ্রস্ততা কিংবা বিকারগ্রস্ততাও নয় – মানুষ ও জীবনের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে সমুন্নত রেখে সোনালি সুদিনের স্বপ্নের কথাই তিনি তাঁর গল্পের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই 'জীবনপ্রেম' (সরোজ, ১৯৯৫ : ৩০১) বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। সত্যিকারের শিল্পী যেমন কালের হয়েও কালোত্তীর্ণ তেমনি তাঁর গল্পগুলো বিশেষ কালের হয়েও সর্বকালের।

তথ্যনির্দেশ

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রভাব সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই একমত। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য কয়েকজন সমালোচকের অভিমত: শিপ্রা দের মতে, 'যুদ্ধের প্রবল অভিঘাত, সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্ঠুরতার পাশে সামন্ত ও ব্যবসায়ীদের নগ্ন শোষণ অত্যাচার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পে ধারণ করেছেন' (শিপ্রা, ১৯৯৬ : ২২)। অরুন্ধতী দাসের মতে, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতা, মন্বন্তর – এসব চিরকালই পরিচিত বিষয় এবং তা বারংবার বিভিন্ন রূপায়ণে আবৃত হয়ে এসেছে' (উত্তম, ১৪২১ : ৩২৫)। মনুয়া পাঁজার মতে, 'তাঁর লেখায় কথা বলে সমকাল। যে কারণে যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, নতুন পুরোনোর দ্বন্দ্ব ইত্যাদি তাঁর বহু গল্পের বিষয়' (উত্তম, ১৪২১ : ২৪৯)। নির্মাল্য সেন শর্মার মতে, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের হতাশা, যন্ত্রণা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পের বিষয়' (উত্তম, ১৪২১ : ৩৩১)

২. দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত গল্পগুলো হলো: 'কেরাসিন', 'কালনাগ', 'হাড়', 'বাঁশবাজি', 'কাক', 'বস্ত্র', ও 'যতনবিবি'। গল্পগুলোর অনেকটা জুড়ে আছে বাংলার নিরন্ন নিম্নবিত্ত মানুষ এবং দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে তাদের বিপন্ন জীবনচিত্র। বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের জীবনালেখ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সমালোচকের মতে, 'অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনালেখ্য রচনায়' (অরুণকুমার, ১০০৪ : ২১২)। তবে তাঁর গল্পে দুর্ভিক্ষ ও

মন্বন্তরের রূপায়ণ থাকলেও 'লালসার অসংযম ও দারিদ্রের আস্ফালনই' (গোপিকানাথ, ২০০০ : ২০২) সেখানে বর্তমান।

৩. প্রবোধ সান্যাল দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর অবলম্বনে গল্প রচনায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প হলো 'অঙ্গার'। গল্পটিতে নিষ্প্রদীপ রাতে ব্যক্তির অনেক কিছু হারানোর বেদনাহত চেহারা অঙ্কিত। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের যথার্থ প্রতিক্রিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেননি, বরং তিনি মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়াকে নিস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

৪. মনোজ বসুর গল্পেও সমাজ বিশ্লেষণের স্পষ্ট প্রবণতা বিদ্যমান। এ সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প 'দ্বীপের মানুষ'। গল্পটিতে একদিকে যেমন রয়েছে মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র, ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল, অন্যদিকে এরই বিপরীতে রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনী মানুষের ছবি, যারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী মানুষের মতোই বৃহত্তর সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ চিত্র আঁকেননি। তাঁর গল্পে মন্বন্তরের কথা এসেছে আভাসে, ক্ষুধার্ত ভিখারির ভিক্ষা চাওয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখায় কোন সমাজতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নেই, আছে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি। তিনি মন্বন্তর ও মহামারীর পটভূমিতে আস্তিক্যবাদী মানুষের মতো মানবতার সত্যরূপের সন্ধান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্পগুলো হল: 'ইস্কাপন', 'আখেরী', 'বোবাকান্না', 'তিনশূন্য', 'পৌষলক্ষ্মি', 'মরা মাটি', 'অহেতুক'। গল্পগুলোতে তিনি মন্বন্তর শব্দের অর্থকে আরও প্রসারিত করেছেন। তিনি মনে করেন মন্বন্তরের মূল কারণ যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে তোলে মানুষ।

৭. সাম্যবাদী নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত গল্পে অনাহার আক্রান্ত মানুষের নির্জীবতা ও নৈরাশ্যকে বড় করে এঁকেছেন; গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তি ও পরিবার-জীবনে দুর্ভিক্ষের প্রভাব যে কত নৃশংস, মর্মবিদারক ও শোচনীয় তা দেখিয়েছেন; একটা চাপা প্রতিবাদের সুর এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতিরোধ চেতনাকে রূপায়িত করেছেন; বেশ কয়েকটি গল্পে তিনি যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চিত্র রূপায়ণ বা দুর্ভিক্ষ জনিত প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে দুর্ভিক্ষের আভাস এবং এসবের মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন; কয়েকটি গল্পে মানবতার বঞ্চনার ব্যথিতচিত্ত এবং এক সংবেদনশীল মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের কাহিনি সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামজীবনের রূপায়ণ করলেও তাঁর গল্পে উপেক্ষিত থেকেছে খাদ্যের সন্ধানে নগর কলকাতায় আসা বিপন্ন মানুষের জীবনচিত্র। গল্পের বিস্তৃত পরিসর ধরে, বঞ্চিত, উৎপীড়িত মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে যে ঐ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কোনো বিকল্প নেই–এই জাতীয় বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি। 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'আজকাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'খতিয়ান' (১৯৪৭), 'ছোটবড়' (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলো এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে সুবোধ ঘোষ রচিত গল্পগুলো হলো: 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'কর্ণফুলির ডাক', 'তমসাবৃতা'। তাঁর গল্পগুলো সমাজ-ভাবনায় ভাস্বর, সমাজ বিশ্লেষণে উন্মুখ।

৯. নবেন্দু ঘোষ সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত। সেই পরিচয়ের চিহ্ন তাঁর গল্পের সর্বত্র। তাঁর গল্পে বুভুক্ষু মানুষদের ক্ষুধার তাড়নায় অমানবিক আচরণের মধ্যেই রয়েছে মন্বন্তরের ছবিরই ব্যঞ্জনা। মানুষের মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করে মন্বন্তর তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে অসীমে ব্যাপ্ত করে ফেললেও তিনি শুধু অন্ধকারের দিকটিই দেখেননি, আলোর দিকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'বাঁকা তলোয়ার' গল্পে আলোর পরিচয় স্পষ্ট। 'কল্কি' গল্পে তিনি তিক্ত বিষন্নতায় মন্বন্তরের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন।

১০. যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকে অবলম্বন করে গল্প রচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি 'বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার কিন্তু তাঁর দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নয়' (প্রভাস, ২০০৪ : ১২৫)। তিনি সময় এবং সমাজ বিশ্লেষণের তুলনায় অধিকতর নিবিষ্ট হয়েছেন মানব মনস্তত্ত্বের চিরন্তন রহস্যের অতলতার সন্ধানে। তাই গল্পে তিনি সমাজ বিশ্লেষণে যেতে আগ্রহী হননি; পরিবর্তমান সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়েও অপরিবর্তনীয় কিছুর সন্ধান করেছেন। তাঁর গল্পে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ বাইরের পটভূমি হিসেবেই এসেছে।

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন। 'নয়নচারা' ও 'মৃত্যুযাত্রা' গল্প দুটিতে তিনি মন্বন্তরকালের বিপন্ন মানুষের জীবনচিত্র ও মনোজাগতিক ভাবনাকে এবং যুদ্ধযুগের মুহূর্তকে সার্থকভাবে উচ্চকিত রূপ দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ১৪০৫। গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ১৪০৬। গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ১৪০৬। গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

দে, শিপ্রা, ১৯৯৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.) ১৪২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ১৯৯৩। নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা।

দত্ত, বীরেন্দ্র, ২০০৯। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (২য় খণ্ড), কলকাতা।

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.) ১৪২১। উজাগর: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, হাওড়া।

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পা.), ১৩৯৮। কোরক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, ২য় পর্ব, কলকাতা।

কবিরাজ, নরহরি, ১৯৭৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, কলকাতা।

আকতার কামাল, বেগম, ২০০০। বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, ২০০৪। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা।

ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. মুহম্মদ আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ. বি. এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, ২০০৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা।

দত্ত, সরোজ, ১৯৯৭। কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা।

সেন, অমর্ত্য, ১৪১৮। জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, কলকাতা।

Nehru, Jawaharlal, 1974। The Discovery of India, Bombay।

হক, সৈয়দ আজিজুল, ১৯৯৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, ঢাকা।

রুদ্র, তপন (সম্পা.), ২০০০। জীবনানন্দ দাশ কবিতা সমগ্র, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ২০০৫। বিভূতিভূষণ রচনাবলি (৫ম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা।

মামুদ, হায়াৎ (সম্পা.), ২০১১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্পসমগ্র, ঢাকা।

সালেকীন, সিরাজ, ২০০৬। জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল, অক্টোবর ২০০৪। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মন্বন্তরের চালচিত্র', এস. এম. লুৎফর রহমান (সম্পা.), সাহিত্য পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১০/জুন ২০০৩, ঢাকা।

গোস্বামী, অরিন্দম, ২০০১। সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ১৯৯৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০০৪। কালের পুত্তলিকা, কলকাতা।

রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, ২০০০। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা।

রায় চৌধুরী, প্রভাস, ২০০৪। জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা।

রহমান, মোঃ আতাউর, ২০১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : আঞ্চলিক জীবন, ঢাকা।

দাশ, জীবনানন্দ, ১৩৬২। কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ১৯৯৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা।